ও

এরভিন শ্রয়েডিংগার

অনুবাদ ঃ পূর্ণিমা সিংহ

Appd for ISES

[illegible]

23/3/91

মন ও জড়বস্তু

এরভিন শ্রয়েডিংগার

অনুবাদ : পূর্ণিমা সিংহ

বাউলমন প্রকাশন
২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌স
কলিকাতা : ৭০০০১৯

প্রকাশক ঃ
দেবব্রত ভট্টাচার্য
২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স
কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯০

প্রচ্ছদ :
পূর্ণিমা সিংহ

মুদ্রক ঃ
শ্রীমুদ্রণ
১নং খাসমহল রোড
কলিকাতা-৭০০০৬

মূল্য : ১৮ টাকা

ভূমিকা

অনুবাদিকার কৈফিয়ৎ : বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী Schrödinger তাঁর কেমব্রিজ বক্তৃতামালার (1956) এক অংশ Mind and Matter নামে প্রকাশ করেছেন। প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় লেখা এই বইটিতে পদার্থবিজ্ঞানের সীমা পার হয়ে মানুষের মনের সঙ্গে বস্তুজগতের সম্বন্ধের প্রতি গভীর অনুসন্ধানের পথ নির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আরও নানা সমস্যার প্রশ্ন তুলেছেন, যে বিষয়ে আধুনিক যুগের মানুষের বিশেষ চিন্তা করা প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে এই বইটি পড়ে জ্ঞানলাভ করা কঠিন নয়। তবে বাংলায় অনুবাদের সার্থকতা কি ? Schrödinger নিজেও তাঁর মাতৃভাষা German এর বদলে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে অস্বস্তি জ্ঞাপন করেছেন। মাতৃভাষার ধারায় প্রবাহিত বক্তব্য মানুষের মনকে সবচেয়ে সুস্থির আগ্রহে অনুধাবন করতে সাহায্য করে একথা সুবিদিত। পদার্থবিজ্ঞানের কোনো সমস্যার গাণিতিক রূপ অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠলে অনেক সময় স্থান কাল নির্ণয়কারী অক্ষ-ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সেই গণিতকে একটা সুবিধাজনক অক্ষ-ব্যবস্থায় প্রক্ষেপ করে নিলে, অর্থাৎ Co-ordinate transformation করলে গাণিতিক রূপের আরও সরল চেহারা হয় এবং তাতে চিন্তার পথ সুগম হয়। মাতৃভাষায় রূপান্তর সেইরকম co-ordinate transformation। ব্যক্তিগতভাবে এই পুস্তকটির অত্যন্ত দুরূহ গভীর বক্তব্য বুঝতে গিয়ে যখন তার উপযুক্ত বাংলা কথা খুঁজতে গিয়েছি তখনই অর্থ অনেক সুস্পষ্টরূপে মনে দেখা দিয়েছে। মনে হয় অন্যান্য অনেক বাঙালী পাঠকের পক্ষেও সবচেয়ে চেনা কথার ভেতর দিয়ে অজানা বক্তব্যকে পাওয়া হয়ত সহজতর হবে। পঁয়ত্রিশ বছরেরও আগে আলোচিত এইসব সমস্যাগুলি বর্তমান যুগেও অসমাধিত এবং আরও বিশেষভাবে স্মরণ করা এবং বহুল প্রচার প্রয়োজন। যাতে অনেক মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা সমস্যা সমাধানের পথের সন্ধানে নিয়োজিত হয়।

সব কথা সম্পূর্ণ বুঝেছি বা মেনেছি বলব না। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম স্রষ্টা Schrödinger এর লেখার প্রতি পদে পদার্থবিদের দৃঢ় সংযমের সঙ্গে সাহসী কল্পনার কবিসুলভ মুক্তির স্বাদ পাওয়ার একটি বিরল অভিজ্ঞতা হয়েছে, যে স্তরে বিজ্ঞানী ও শিল্পী একাধারে বিরাজ করছেন। এই মনীষার চিন্তাধারার সংস্পর্শে সাময়িক ভাবে হলেও মনের উত্তরণ ঘটে। এই অভিজ্ঞতা মাতৃভাষায় অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নেবার সম্ভাবনা ভাল লেগেছে।

পূর্ণিমা সিংহ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিজ্ঞান এবং অন্যান্য নানা জ্ঞানান্বেষী কয়েকজন পাণ্ডুলিপিটি পড়ে সুচিন্তিত মূল্যবান মন্তব্য করে আমাকে উপকৃত করেছেন। এ'দের মধ্যে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ রায়, উৎপল চট্টোপাধ্যায়, সত্যকাম সেনগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ দাস, সুকন্যা সিংহ, সুপূর্ণা সিংহ এবং সুরজিৎ সিংহের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই।

ডাঃ শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত এবং তাঁর সহকর্মী, এই পুস্তকের প্রকাশক দেবব্রত ভট্টাচার্য অতি যত্ন সহকারে পাণ্ডুলিপিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পড়ে কিছু কিছু অভিধান অনুমোদিত পরিভাষা প্রতিস্থাপনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রস্তাবিত প্রচলিত পরিভাষা যথার্থ অনুবাদের পক্ষে উপযুক্ত মনে করে আমি গ্রহণ করেছি। এবং এই অনুবাদ প্রকাশে তাঁদের অবিচল আগ্রহ আমাকে লেখাটি সম্পূর্ণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। লেখাটিতে যদি অন্য কোনো ত্রুটি থেকে যায় তার দায়িত্ব আমার।

কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস এই অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন বলে সেই সংস্থার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

পূর্ণিমা সিংহ
উদয়াচল, শ্যামবাটি
শান্তিনিকেতন ৭৩১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ
৪ এপ্রিল ১৯৯০

এরভিন শ্রয়েডিংগার (জন্ম—1887, মৃত্যু—1961)

এরভিন শ্রয়েডিংগার আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 1926 খৃষ্টাব্দে চারটি বিখ্যাত গবেষণা পত্রে তরঙ্গগতিবিদ্যার যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রবর্তন করার জন্য 1933 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তির সম্মানে ভূষিত হন। তরঙ্গগতি-বিদ্যা প্রবর্তনের কিছুকালের মধ্যেই পারমাণবিক গবেষণায় বিরাট অগ্রগতি হতে থাকে। শ্রয়েডিংগার এই অগ্রগতিতে অত্যন্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শ্রয়েডিংগার 1887 খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানের ঐতিহ্যমণ্ডিত বিখ্যাত ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। যে শিক্ষায়তনে Mach এবং Ludwig Boltzmann-এর মত বিজ্ঞানী শিক্ষালাভ করেছিলেন। 1927 খৃষ্টাব্দে শ্রয়েডিংগার Berlin-এ Max Planck-এর উত্তরাধিকারী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হিটলারের অভ্যুত্থানের পর তিনি জার্মানী ত্যাগ করে Dublin Institute of Advanced Studies-এ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান পদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি একীভূতক্ষেত্র তত্ত্বে গবেষণায় আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা ও অনুশীলনের ক্ষেত্র বহুধাব্যাপ্ত ছিল। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় সতত সৃজনশীল থেকেও তিনি তাঁর বিশেষ চর্চার ক্ষেত্রের গণ্ডী অতিক্রম করে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুচিন্তিত বিশিষ্ট ধারায় কয়েকটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল সুলিখিত পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। Mind and Matter, What is Life, Science and Humanism, Physics in our Times ইত্যাদি পুস্তক তার নিদর্শন।

পূর্ণিমা সিংহ : জন্ম কলকাতা 1927।

1950 : এম. এস. সি, পদার্থবিজ্ঞান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

1956 : পি. এইচ. ডি পদার্থবিজ্ঞান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে খয়রা গবেষণাগারে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তত্ত্বাবধানে।

বিষয় : তাপের প্রভাব ও এক্সরশ্মি বিশ্লেষণে মৃত্তিকাখনিজের গঠন ও প্রকৃতি অনুসন্ধান। পরবর্তীকালে 1960—61 ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় ও 1966—87 কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানে খনিজ পদার্থ বিজ্ঞান, সিরামিকের রঙ ইত্যাদি বিষয়ে এবং 1963—64 আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবপদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ও 1965—66 কলকাতা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আণবিক বিবর্তনে 'প্রাণ'-এর উদ্ভব বিষয়ে গবেষণা।

1987-এ কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী পদ থেকে অবসর গ্রহণ। পেশাগত গবেষণা পত্র ছাড়া বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী, সঙ্গীত ও শিল্প বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ইংরাজী ও বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশ।

প্রকাশিত পুস্তক :

An Approach to the Study of Indian Music (1970)।

বিজ্ঞান সাধনার ধারায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু (1980)।

সূচীপত্র :

প্রথম পরিচ্ছেদ

চেতনার বস্তুগত ভিত্তি

সমস্যা ঃ

বহির্জগতের ধারণা আমরা আমাদের বিভিন্ন অনুভূতি, প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও সংরক্ষিত স্মৃতিসমূহের সমন্বয়ে গড়ে তুলি। জগতের একটা নিজস্ব বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্বের কল্পনা করা সুবিধাজনক। কিন্তু নিশ্চয়ই শুধু এইরকম একটা অস্তিত্বই জগৎকে প্রতিভাত করতে পারে না। প্রতিভাত হওয়াটা এই জগতেরই বিশেষ এক অংশে, অর্থাৎ মস্তিষ্কে কিছু বিশেষ ধরনের ঘটনা চলাচলের ওপর নির্ভর করে। এই ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত অন্তর্নিহিত তাৎপর্যমূলক প্রশ্ন উপস্থিত করে : মস্তিষ্কের এইসব কর্মপ্রণালীর মধ্যে কোন্ বিশিষ্ট গুণাবলী এই প্রতিভাত হওয়া ঘটাতে পারে ? আমরা কি আন্দাজ করতে পারি, কোন্ কোন্ বস্তুগত প্রক্রিয়ার এই ক্ষমতা আছে বা নেই ? অথবা আরও সহজ প্রশ্ন : কী ধরনের বস্তুগত প্রক্রিয়া চেতনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ?

একজন যুক্তিবাদী মানুষ চট করে এই প্রশ্নের বিবেচনা হয়ত মোটামুটি এইভাবে করতে উদ্যত হবেন : আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর সদৃশ প্রাণীদের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে চেতনা সুসংবদ্ধ জীবিত বস্তুর কিছু প্রক্রিয়াসমষ্টির—অর্থাৎ বিশেষ কিছু স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত বলে ভাবা যেতে পারে। কতদূর অতীতের বা কত 'নীচু' স্তরের জীব-জগতের মধ্যেও কোনোরকম চেতনা থাকতে পারে এবং প্রাথমিক অবস্থায় তার রূপ কেমন হতে পারে এ সব অনির্দিষ্ট অনুমানের প্রশ্ন। এ প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর দেওয়া যায় না, এবং এসব ভাবনা অলস স্বপ্নবিলাসীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। অন্যান্য নানা ঘটনা, যেমন অজৈব বস্তুর ভিতরের ঘটনাবলী, এমন কি সমস্ত বস্তুগত ঘটনাও হয়ত বা কোনো না কোনো ভাবে চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে এমন চিন্তাতেও ব্যাপৃত হওয়া যায়, যে সব চিন্তা আরও অমূলক অনর্থক। এ সবই অলীক কল্পনা, যা প্রমাণ বা খণ্ডন কিছুই করা যায় না। সুতরাং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার কোনো মূল্য নেই।

যিনি এইভাবে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া মেনে নেন, তাঁকে জানানো দরকার, এর ফলে তাঁর জগৎচিত্রের ভিতরে তিনি কতখানি অস্বস্তিকর ফাঁক রেখে দিচ্ছেন। কারণ কিছু বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে স্নায়ুকোষ ও মস্তিষ্কের উদ্ভব একটা অত্যন্ত বিশিষ্ট ঘটনা, যার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বেশ ভালভাবেই বোঝা হয়েছে। এটা একটা বিশেষ ব্যবস্থা যার সাহায্যে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে সাড়া দিয়ে নিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রক্রিয়া পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার একটা পদ্ধতি। এই কাজের জন্য অন্যান্য নানা পদ্ধতির মধ্যে এটিই সবচেয়ে নিপুণ ও বহুধাবিস্তৃত পদ্ধতি, এবং যখনই এর উদ্ভব হয়, তখনই তা দ্রুতগতিতে প্রাধান্যলাভ করে। তবুও এটি একমাত্র পদ্ধতি নয়। প্রাণিজগতের একটি বিরাট শ্রেণী, বিশেষ করে উদ্ভিদ সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে প্রায় একই রকমের কাজ সম্পন্ন করে।

উচ্চতর প্রাণীদের বিকাশের পথ এই যে বিশেষ পরিণতির দিকে বাঁক নিল, যার উদ্ভব নাও ঘটতে পারত, শুধু তাই ছিল চেতনার আলোকে জগতের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার একমাত্র শর্ত, এ কথা কি আমরা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত? না হলে কি তা শুধু শূন্য আসনের সামনে একটা নাটকের অনুষ্ঠান হয়েই থাকত? তার অস্তিত্ব কারো জন্যই থাকত না? বস্তুত তার অস্তিত্বই থাকত না? আমার মনে হয় এটা একটা দেউলিয়া জগৎ চিত্র। এ রুদ্ধপথ থেকে মুক্তি খোঁজার একটা উপায় সন্ধানের আগ্রহকে বিজ্ঞ যুক্তিবাদীর ব্যঙ্গোক্তির ভয়ে দমিয়ে রাখাটা অনুচিত মনে হয়।

স্পিনোজার (Spinoza) মতে প্রত্যেকটি বস্তু এবং সত্তাই অনন্ত বস্তু, অর্থাৎ ঈশ্বরের রূপান্তর। সব কিছুই তাঁর গুণাবলী, বিশেষ করে ব্যাপ্তি ও চিন্তাশক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করে। প্রথমটি স্থান ও কালে বস্তুর অবস্থান, এবং দ্বিতীয়টি সজীব মানুষ বা জন্তুর ক্ষেত্রে তার মন। কিন্তু স্পিনোজার মতে যে কোনো নিষ্প্রাণ বস্তুও 'ঈশ্বরের চিন্তা'র প্রতিরূপ। অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বিতীয় গুণটিও তাতে রয়েছে। এখানে আমরা বিশ্বজাগতিক প্রাণের অস্তিত্বের দুঃসাহসিক চিন্তার সম্মুখীন হচ্ছি, যদিও সে চিন্তা তখনই প্রথম হয়েছে তা নয়, এমন কি এমন চিন্তা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেও তখন প্রথম হয়েছে তা নয়। দু'হাজার বছর আগে আয়োনীয় (Ionian) দার্শনিকরা এই মতবাদ থেকে হিলোজোইস্ট (Hylozoist)

উপাধি অর্জন করেছিলেন। স্পিনোজার পরে গুস্তাভ থিয়োডোর ফেকনারের (Gustav Theodor Fechner) প্রতিভা উদ্ভিদ এবং পৃথিবী ও গ্রহমণ্ডলী ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুতেও আত্মার গুণ আরোপ করতে সঙ্কুচিত হয়নি। আমি এইসব অলীক কল্পনার পক্ষপাতী নই। কিন্তু ফেকনার বা দেউলিয়া যুক্তিবাদীর মধ্যে কে গভীরতম সত্যের বেশি কাছে পৌঁছতে পেরেছেন, সে সম্বন্ধেও আমি বিচারকের মত রায় দিতে চাই না।

একটি সাময়িক উত্তর

দেখা যাচ্ছে যে, চেতনার ক্ষেত্রের সীমারেখাকে বিস্তৃত করার যে কোনো চেষ্টায় যদি প্রশ্ন তোলা যায় যে, স্নায়ুতন্ত্রীর ক্রিয়াকলাপের বাইরে চেতনার কোনোরকম অস্তিত্ব আছে কিনা, তবে অবধারিতভাবে অপ্রমাণিত এবং অপ্রমাণযোগ্য অনিশ্চিত অনুমানের পথে যেতে হবে। কিন্তু আমরা যদি উল্টোপথে যাই তবে অনেক পোক্ত জমির ওপর চলতে পারব। স্নায়ু বা এমন কি মস্তিষ্কেরও প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে কিন্তু চেতনার সহযোগ নেই। অনেকগুলিতেই নেই। যদিও শারীরতাত্ত্বিক বা জীবতাত্ত্বিক নিরিখে সেগুলি অনেকটা 'চেতন' প্রক্রিয়ার মত। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলিতে জীবতাত্ত্বিক লক্ষণ বিচারে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ব্যবস্থা থাকে—যেমন স্নায়ুবাহিত বহির্ঘাতের পর অন্তর্ঘাতের অনুগমন এবং ভিতরের তন্ত্রের অবস্থা এবং বাইরের পরিবর্তনশীল পরিবেশ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ও তার সময় নিয়ন্ত্রণ। প্রথমত এ ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের অংশের স্নায়ুগ্রন্থিগুলি এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্নায়ুতন্ত্রে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action) দেখতে পাই। কিন্তু আরও অনেক প্রতিবর্ত ক্রিয়া আছে (সেটাই আমাদের আলোচনার বিশেষ বিষয় হবে) যা মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে পার হলেও একেবারেই চেতনার পর্যায়ভুক্ত হয় না, বা সেগুলির সে পর্যায়ে পৌঁছন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রের বিশিষ্ট লক্ষণের ভেদরেখা যথেষ্ট নির্দিষ্ট নয় ; সম্পূর্ণ চেতন ও সম্পূর্ণ অচেতনের মধ্যবর্তী বিভিন্ন মাত্রা পাওয়া যায়। শরীরতত্ত্বের নিরিখে যে সব প্রক্রিয়াগুলি এইরকম পর্যায়ভুক্ত এবং আমাদের শরীরের ভিতরেই ঘটছে, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে যুক্তিবিচারের সঙ্গে পরীক্ষা করলে, আমরা যে সব বিশিষ্ট লক্ষণের অনুসন্ধান করছি তা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

আমার মনে হয় নিম্নলিখিত কয়েকটি সুবিদিত তথ্য থেকেই আমাদের অনুসন্ধানের চাবিকাঠি পাওয়া যাবে : আমাদের অনুভূতি ও দৃষ্টির সাহায্যে বা কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা যে সব ঘটনা পরম্পরায় অংশ গ্রহণ করি সে সব যদি একই ঘটনাসূত্রে ঘন ঘন একই ভাবে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তবে ক্রমশ তা আমাদের চেতনার গণ্ডীর বাইরে পড়ে যায়। কিন্তু যখনই সেই ঘটনা পরম্পরার চলার পথের পটভূমিকায় অথবা পরিবেশে আগের অবস্থা থেকে কোনো পরিবর্তন ঘটে তৎক্ষণাৎ তা চেতনার গণ্ডীতে প্রবেশ করে। তার মধ্যেও ঘটনা পরম্পরার সেইসব পরিবর্তনই প্রথমে চেতনার গণ্ডীতে পৌঁছয়, যেগুলি আগের ঘটনা থেকে নতুন ঘটনাকে আলাদা বলে চিনিয়ে দেয় এবং প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে 'নতুনভাবে বিবেচনা' করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এমন ব্যাপারের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। তাই আপাতত কোনো বিশেষ বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত রইলাম।

চেতনা থেকে ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা আমাদের মানসিক জীবনের সমগ্র গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গঠন সম্পূর্ণভাবেই পুনরাবৃত্তি করে অভ্যাস আয়ত্ত করার প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। রিচার্ড সিমন (Richard Semon) এই প্রক্রিয়াকেই সাধারণীকরণ করেছেন নেম (Mneme)-এর কল্পনায়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আরও আলোচনা করব।

কখনও পুনরাবৃত্তি হয় না তেমন একটা একক অভিজ্ঞতা জীববিদ্যার মানদণ্ডে তাৎপর্যহীন। যে পরিস্থিতি বারংবার উপস্থিত হয়, অনেকক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয় এবং জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে হলে যে পরিস্থিতিতে একই প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, জীববিদ্যার নিরিখে সেইরকম পরিস্থিতির উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া শেখারই মূল্য রয়েছে। একটা নতুন উপাদান কয়েকবার পুনরাবৃত্তির পর 'আগেই দেখা হয়েছে' এইভাবে মনে উপস্থিত হয়, রিচার্ড আভেনারিয়াস (Richard Avenarius) যার নাম দিয়েছেন 'নোটাল' (notal)। বেশিবার পুনরাবৃত্তি হলে একটা ঘটনামালা ক্রমান্বয়ে একটা একঘেয়ে নিয়মে পরিণত হয়, উত্তরোত্তর আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে এবং চেতনা থেকে ক্রমশ অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি প্রতিক্রিয়ার রূপও ক্রমশ বেশি নির্ভরযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছেলেটি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে, মেয়েটি বাঁধা সুরে পিয়ানো বাজায় 'প্রায়

ঘুমের ঘোরে'। আমরা আমাদের কারখানা যাবার অভ্যস্ত পথ ধরে চলি, অভ্যাসগত স্থানে রাস্তা পার হই, রাস্তার মোড়ে বাঁক নিই, অথচ তখন আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকে। কিন্তু যখনই আমাদের পরিবেশে উপস্থাপিত একটা ব্যতিক্রম দেখা দেয়, যেমন রাস্তা পার হবার জায়গায় জমিটা একটু উঁচু হবার ফলে একটু ঘুরে যাবার দরকার হয়, তখন সেই বৈচিত্র্য এবং তার আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া আমাদের চেতনার স্তরে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু যদি সেই ব্যতিক্রমের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে তবে আবার তা শীঘ্রই চেতনার গণ্ডীর সীমার বাইরে মিলিয়ে যায়। পরিবর্তনশীল বিকল্পের সম্মুখীন হলে দুই শাখায় ভাগ হয়ে ব্যতিক্রমের চেতনা আবার এইভাবে স্থিতিলাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার ঘর কিম্বা পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার যদি বার বারই আমাদের গন্তব্যস্থান হয়, তা হলে বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই আমরা ঠিক জায়গায় বাঁক নিই।

এইভাবে নানা ব্যতিক্রম, সাড়া দেবার বিভিন্ন ধরন, দ্বিধাবিভক্ত হওয়া ইত্যাদি একের পর এক স্তূপীকৃত হয়ে জমা হতে থাকে অগণিত পরিমাণে। কিন্তু শুধু সাম্প্রতিকতম ঘটনাগুলি চেতনার গণ্ডীভুক্ত থাকে—যে ঘটনাগুলি সম্বন্ধে প্রাণীটি তখনও শিক্ষাগ্রহণ বা অভ্যাস করার অবস্থায় থাকে। রূপকের সাহায্যে বলা যায় যে, চেতনা হচ্ছেন শিক্ষক, যিনি জীবিত প্রাণীর শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু যে সব কাজে ছাত্র যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েছে সে সবের মোকাবিলা করার জন্য তাকে নিজের মত ছেড়ে দেন। কিন্তু তিনবার লাল কালির দাগ দিয়ে বলতে চাই যে, এটা রূপক মাত্র। আসল ব্যাপারটা হল, নতুন পরিস্থিতি এবং সেই পরিস্থিতি উদ্ভূত সাড়াই চেতনার আলোকে ধরা থাকে। পুরনো এবং ভালভাবে অভ্যস্ত বিষয় আর সেভাবে রাখা থাকে না।

প্রাত্যহিক শত শত কাজকর্মের যে অনুষ্ঠান ও পরিচালনা আমরা করি তা একসময়ে বহু যত্নে এবং অত্যন্ত মনোযোগ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে শিখতে হয়েছে। একটি ছোট শিশুর হাঁটার প্রথম প্রচেষ্টাগুলির উদাহরণ দেখা যাক। সেই প্রচেষ্টাগুলি বিশেষভাবে চেতনার কেন্দ্রীভূত থাকে ; প্রথম সাফল্যগুলিকে শিশুটি বিপুল হর্ষধ্বনিতে অভ্যর্থনা জানায়। যখন একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি জুতোর ফিতে বাঁধেন, সুইচ টিপে আলো জ্বালেন, সন্ধ্যায় কাপড় ছাড়েন, ছুরি কাঁটা দিয়ে খেতে থাকেন—এই কাজগুলি তখন তাঁর চলমান চিন্তার কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না।

অথচ এইসব কাজগুলিই তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট করে শিখতে হয়েছিল। এইরকম ব্যাপার মাঝে মাঝে বেশ মজার অঘটন ঘটায়। একজন বিখ্যাত গণিতবিদ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। তাঁর বাড়িতে যখন সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রিত অতিথিরা এসেছেন, তাঁর স্ত্রী দেখলেন তিনি আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। এটা কীভাবে ঘটে থাকতে পারে? তিনি সার্টের কলার পরতে শোবার ঘরে গিয়েছিলেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকে, শুধুমাত্র পুরনো সার্টের কলার খোলার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী অভ্যস্ত কর্মমালা একের পর এক ঘটতে থাকে।

আমাদের মানসিক জীবনের ব্যক্তিজনি (ontogeny) থেকে এই রকম যে সমস্ত ব্যাপার আমাদের ভালভাবেই জানা আছে, তেমন ব্যাপারই আমাদের হৃৎস্পন্দন, অন্ত্রের ক্রমসংকোচ (peristalsis of the bowels) ইত্যাদির মত শ্রেণীগত অবচেতন ক্রিয়াকলাপের জাতিজনির (phylogeny) ওপর আলোকপাত করে বলে আমার মনে হয়। প্রায় একই রকম অথবা নিয়মিত পরিবর্তনশীল নানা অবস্থার সম্মুখীন হতে হতে ক্রমাগত সুষ্ঠুভাবে অভ্যাসের ফলে এইসব কার্যাবলী বহুকাল ধরে চেতনার গণ্ডীর বাইরে চলে গিয়েছে। এসব ক্ষেত্রেও অনেক সময় চেতন-অচেতনের মধ্যবর্তী অনেক স্তর থাকতে পারে। যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এমনিতে অবচেতনাতেই চলতে থাকে কিন্তু অবস্থার ব্যতিক্রমে, যেমন ধোঁয়াভরা বাতাসে অথবা হাঁপানীর আক্রমণে তা পরিবর্তিত হয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। আর একটি উদাহরণ হল দুঃখ, আনন্দ বা শারীরিক যন্ত্রণায় কান্নায় ভেঙে পড়া। এইসব ঘটনা যদিও সচেতন, কিন্তু ঠিক ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত নয়। উত্তরাধিকারের স্মৃতিবাহিত সূত্রে পাওয়া কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে আরও কিছু মজার কাণ্ড ঘটে। যেমন ভয়ে চুল খাড়া হয়ে ওঠা, উত্তেজনায় লালা নিঃসরণ বন্ধ হওয়া, ইত্যাদি কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া। এগুলির বহুকাল আগে হয়ত কোনো তাৎপর্য ছিল, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা লুপ্ত হয়ে গেছে।

এর পরের ধাপ, অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত ঘটনার ক্ষেত্রের বাইরে আমাদের আলোচ্য বিষয়কে বিস্তৃত করতে গেলে সকলে চট করে রাজী হবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। আপাতত আমি সংক্ষেপে তার একটু আভাসমাত্র দেব, যদিও ব্যক্তিগতভাবে সেটা আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ প্রথমে যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম—অর্থাৎ কোন্ কোন্ বস্তুগত ঘটনা

চেতনার সঙ্গে যুক্ত, কোন্‌গুলি নয়, সেই প্রশ্নের ওপরই এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বিশেষ-ভাবে আলোকপাত করবে। আমার মতে এ প্রশ্নের উত্তর এইরকম : পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি স্নায়ুতন্ত্র-ঘটিত সাধারণ জৈবিক ক্রিয়াকলাপ তখনই চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় যখন নতুন কিছু ঘটে।

রিচার্ড সিমনের মতে শুধু মস্তিষ্কের উদ্ভব ও বিবর্তনই নয়, ব্যক্তির সমগ্র গঠনই হাজার হাজার বার একইভাবে ঘটে যাওয়া এবং 'ভালভাবে মনে রাখা' ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তির সূত্রে গাঁথা। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি এর প্রথম ধাপগুলি চেতনা-বহির্ভূত—প্রথমে মাতৃগর্ভে এবং তার পরেও জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহ বা মাসের বেশিরভাগ যে সময় ঘুমন্ত অবস্থায় কেটে যায়, সেই সময়ে। তখন শিশুর বিবর্তন একটা চিরাচরিত অভ্যাসের ধারায় চলতে থাকে এবং সে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে তাতে বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। পরবর্তী জৈবিক বিকাশের ধারা তখনই চেতনা সহযোগে চলতে থাকে, যখন এমন সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সক্রিয় হয় যেগুলি ধীরে ধীরে পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের নিযুক্ত করে, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের ক্রিয়াকলাপ মানিয়ে নেয়, পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়, অভ্যাস আয়ত্ত করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। আমাদের মত উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাসেই প্রধানত তেমন একটি ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এই বিন্যাসের সেইসব কার্যকলাপ চেতনা সম্বলিত, যে ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের অভিজ্ঞতা ঘটে। স্নায়বিক বিন্যাস ক্ষেত্রই আমাদের দেহের সেই স্থান, যেখানে এখনও আমাদের প্রজাতিতে জাতিগত রূপান্তর ঘটছে ; রূপকের ভাষায় বলা যায় এটা আমাদের কাণ্ডের ওপরের শাখাপ্রশাখায় নতুন পত্রপুষ্পোদগমের স্থান। আমার সাধারণ প্রকল্প আমি সংক্ষেপে এইভাবে বলতে চাইছি : চেতনা জীবিত বস্তুর নতুন শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত এবং অধীত বিদ্যা চেতনা বিযুক্ত।

নীতিশাস্ত্র

শেষোক্ত সাধারণীকরণ আমার কাছে যদিও খুব গুরুত্বপূর্ণ, তবু অপরের কাছে সংশয়জনক মনে হতেও পারে। এই উক্তি বাদ দিলেও চেতনা সম্বন্ধে যে তত্ত্বের আভাস দিলাম তা হয়ত নীতিশাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝার একটা পথের নির্দেশ দিতে পারে। সর্বযুগে সর্বমানবের ক্ষেত্রেই প্রতিটি নৈতিক বিধান উপযুক্ত মর্যাদায়

গ্রহণ করার পশ্চাৎপট ছিল আত্মঅস্বীকৃতি। নীতিশিক্ষা সব সময়েই 'তোমার এমন হতে হবে' এইরকম একটা আদেশের রূপ পরিগ্রহ করে। এই দাবি কোনো-না-কোনো ভাবে আমাদের আদিম ইচ্ছাবিরুদ্ধ। কোথা থেকে 'আমি এমন হতে চাই' (I will) আর 'তোমার এমন হতে হবে' (thou shalt) এই দুটি ঘোষণার অদ্ভুত বৈপরীত্যের উদ্ভব হল? আমার আদিম ক্ষুধাকে দমন করতে হবে, আমার প্রকৃত সত্তাকে অস্বীকার করতে হবে, আমি সত্যি যা তার থেকে আমাকে অন্যরকম হতে হবে এই দাবি অযৌক্তিক নয় কি? আসলে অন্যান্য সময়ের তুলনায় বিশেষ করে আমাদের যুগে এই ধরনের নির্দেশকে প্রায়ই ঠাট্টা করা হয়। 'আমি যেমন আমি তেমনই, আমার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য সুযোগ দাও। প্রকৃতি যে সব আকাঙ্ক্ষা আমাতে রোপণ করেছেন সেগুলি মুক্তভাবে বিকশিত হতে দাও। যে সব হুকুম এর বিরুদ্ধে যাবে সেগুলি অর্থহীন—ধর্মযাজকদের প্রতারণা। প্রকৃতিই ভগবান আর প্রকৃতি তাঁর খুসীমত আমাকে যে রূপে গড়েছেন তার কৃতিত্ব প্রকৃতিকে দিতে হবে।' এইসব উক্তি কখনও কখনও শোনা যায় এবং এইসব উক্তির সহজ সাদাসিধে স্থূলতা খণ্ডন করা সহজ নয়। কাণ্ট-এর অনুজ্ঞা অবশ্যই অযৌক্তিক।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত পূর্বোক্ত উক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কীটদষ্ট জীর্ণ। জীবের বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞানের সাহায্যে সহজেই বোঝা যায় আমাদের সচেতন জীবনযাত্রাটা প্রকৃতপক্ষে অবধারিতভাবে আমাদের আদিম আত্মবোধের বিরুদ্ধে একটা নিরন্তর সংগ্রাম। কারণ আমাদের প্রকৃতিদত্ত আত্মবোধ, আমাদের আদিম ইচ্ছা এবং তার সহজাত আকাঙ্ক্ষাগুলি নিশ্চয়ই আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বস্তুগত উত্তরাধিকারের মানসিক অভিব্যক্তি। আমরা জীবজগতের একটা প্রজাতিরূপে ক্রমশ বিকশিত হচ্ছি, এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলির পুরোভাগে পদক্ষেপ ফেলে চলেছি। সুতরাং একটি মানুষের প্রত্যেকটি দিনের জীবনযাত্রা আমাদের প্রজাতির বিবর্তনের একটা ছোট অংশ। সেই বিবর্তন এখনো পুরোদমে চলেছে। একথা সত্যি যে, একটি মানুষের জীবনের একদিন কিম্বা তার পূর্ণ জীবন ও সেই চির অপূর্ণ মূর্তি গড়ায় ছেনীর একটা ক্ষুদ্র আঘাত মাত্র। কিন্তু অতীতে আমরা যে বিরাট বিবর্তন পার হয়ে এসেছি তাও এইরকম অজস্র সূক্ষ্ম ছেনীর আঘাতে সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তিযোগ্য জিনের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন বা মিউটেশন (Mutation)-জনিত পরিবর্তনই অবশ্য এই রূপান্তর ঘটার মূলবস্তু এবং পূর্বশর্ত।

তবু রূপান্তরগুলির মধ্যে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত স্থির করার জন্য মিউটেশনের বাহকদের আচরণ ও জীবনের অভ্যাসগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার বিশেষ নির্ধারণ-কারী প্রভাব থাকে। তা না হলে প্রজাতিগুলির উদ্ভব এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটা নির্দিষ্ট দিক অভিমুখী গতির ব্যাপারটা দীর্ঘকাল ধরে ঘটা সত্ত্বেও বোঝা যেত না। সময়টা দীর্ঘ হলেও তা সসীম এবং তার সীমাটা আমাদের ভালভাবেই জানা আছে।

তাই প্রত্যেকটি ধাপে, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিনে যেন তখন পর্যন্ত আমাদের যে গঠন ছিল তার কিছু-না-কিছু পরিবর্তন হতেই হবে, কিছু অতিক্রম করতে হবে, কিছু বর্জন করতে হবে, এবং নতুন কিছু সে স্থানে প্রতিস্থাপিত হবে। পরিবর্তনকারী ছেনীর আঘাতের প্রতি পূর্বতন আকারের প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় মনোগত প্রতিরূপই হল আমাদের আদিম ইচ্ছা-উদ্ভূত প্রতিরোধ। কারণ আমরা নিজেরাই একাধারে ছেনী এবং মূর্তি, বিজেতা এবং বিজিত। যেন যথার্থই আত্মবিজয় চলেছে।

কিন্তু একটি মানুষের জীবনসীমার তুলনায় এবং এমন কি একটি ঐতিহাসিক কাল পরিমাণের তুলনায়ও এই প্রক্রিয়ার যে অসাধারণ মন্থরগতি তাতে এই বিবর্তনের ধাপগুলি সরাসরি লক্ষণীয়ভাবে আমাদের চেতনার জগতে গিয়ে পৌঁছবে এমন একটা অভিমত কি অত্যন্ত অবাস্তব মনে হবে না? এই রূপান্তরগুলি কি অলক্ষ্যে থেকে যাবে না?

না, আমাদের পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে তা হবে না। শেষ পর্যন্ত আমরা চেতনাকে সেইসব শারীরিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করেছি যেগুলি পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে পরিবর্তনগুলি যতক্ষণ শিক্ষাগ্রহণের পর্যায়ে থাকে ততক্ষণই সেগুলি চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকে। অনেক পরে শিক্ষা সম্পন্ন হলে সেগুলি ভালভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রজন্মপরম্পরায় স্থিত সম্পদরূপে প্রাণীর অচেতন স্তরে সঞ্চিত থাকে। সংক্ষেপে: চেতনা বিবর্তনের পরিমণ্ডলের ঘটনা। এই জগৎ তার নিজের রূপ উদ্ভাসিত করে শুধু সেইখানে এবং সেই অনুযায়ী, যেখানে এবং যতদূর তার বিকাশ ঘটছে ও নতুন রূপ সৃষ্টি হচ্ছে। স্থবির অংশগুলি চেতনা থেকে লুপ্ত হয়। তারা আবার উদিত হতে পারে শুধুমাত্র বিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের পারস্পারিক ক্রিয়ায়।

এ কথা যদি স্বীকৃতি পায় তবে মানতে হবে চেতনা এবং আত্মবোধের সঙ্গে বিরোধ বা অসঙ্গতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এমন কি এও বলা চলে, চেতনা এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সমানুপাতিক। যদিও কথাটা পরস্পরবিরোধী শোনাবে, কিন্তু সর্বযুগের এবং সর্ব মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা এ কথা সমর্থন করেছেন। যে সব নরনারীর কাছে চেতনার অসাধারণ উজ্জ্বল আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছে, যাঁরা অন্যদের চেয়ে অনেক বড় মাপে মানবিকতা নামক শিল্পকর্ম বিশেষ দক্ষতায় গড়ে তুলেছেন, রূপান্তর ঘটিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের লেখায়, কথায় এবং তাঁদের জীবনধারা দিয়ে প্রকাশ করেছেন যে, সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁরা অন্তরের অন্তর্নিহিত এই বৈষম্যের যন্ত্রণায় অনেক বেশি কাতর হয়েছেন। এ যন্ত্রণা যাঁরা ভোগ করেছেন এটা তাঁদের কাছে একটা সান্ত্বনার কথা। এছাড়া কখনও স্থায়ী ফলপ্রসূ কোনো কিছু সৃষ্ট হয় নি।

আমাকে দয়া করে ভুল বুঝবেন না। আমি একজন বিজ্ঞানী, নীতিশিক্ষক নই। আমাদের প্রজাতি একটা উচ্চতর লক্ষ্য অভিমুখে বিকাশলাভ করার ধারণা প্রবর্তনের একটা কার্যকরী পন্থা হবে ভেবে এবং সেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই আমি নৈতিক বিধানগুলি প্রচার করতে চাইছি মনে করবেন না। তা হতেই পারে না। কারণ সেটা একটা নিঃস্বার্থ লক্ষ্য, একটা নিরাসক্ত উদ্দেশ্যের প্রবণতা, যা মেনে নেওয়া মানে সত্যনিষ্ঠার স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব পূর্বাহ্নেই মেনে নেওয়া। কান্টের অনুজ্ঞা—'করতে হবে'র স্বতঃসিদ্ধতা অন্যান্যদের মত আমিও ব্যাখ্যা করতে পারব না। নৈতিক বিধানের সরলতম সাধারণ রূপ (নিঃস্বার্থ হও !) একটা সরল স্বীকৃত সত্য, যেটার অস্তিত্ব রয়েছে। যাঁরা কার্যত এ নীতি পালন করেন না, তাঁদের বিরাট সংখ্যক অংশও এ নীতি মেনে নেন। আমার মনে হয়, এই দুর্বোধ্য নির্দেশের অস্তিত্ব, আমাদের জৈবিক বিবর্তনের পথে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে পরার্থপরতার মনোভাব গঠনের দিকে রূপান্তরের সূচনার—মানুষের **সামাজিক জীব** হয়ে ওঠার নির্দেশক। একজন নিঃসঙ্গ জীবের পক্ষে আত্মকেন্দ্রিকতা একটা গুণ বলে গণ্য। এই গুণ তার প্রজাতিকে রক্ষা করে এবং উন্নত করে। যে কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ শ্রেণীর পক্ষে সেটা পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো প্রাণী যদি গোষ্ঠীবদ্ধ রাষ্ট্র গড়তে গিয়ে তার আত্মকেন্দ্রিকতা যথেষ্ট সংযত না করতে পারে, তবে তার বিনাশ হবে। জীবজগতের শ্রেণী বিবর্তনের পথে অনেক প্রাচীন সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনকারী যেমন

মৌমাছি, পিঁপড়ে, উই তাদের আত্মবোধ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছে। অবশ্য তার পরের ধাপ, অর্থাৎ জাতিগত একাত্মবোধ বা সংক্ষেপে জাতীয়তাবোধ তাদের মধ্যে পুরোদমে চলছে। একটি কর্মী মৌমাছি যদি পথ হারিয়ে একটা ভুল চাকে ঢুকে পড়ে তবে তাকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করা হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে মনে হয় একটি ব্যাপার প্রায়ই ঘটছে। প্রথম রূপান্তর প্রায় সম্পূর্ণ হবার আগেই একই অভিমুখে দ্বিতীয় রূপান্তরের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যদিও আমরা যথেষ্ট জোরদারভাবে আত্মকেন্দ্রিক তবু আমাদের অনেকেই অনুভব করছেন যে, জাতীয়তাবোধও একটা দোষ যা পরিত্যাগ করা উচিত। হয়ত একটা অদ্ভুত ব্যাপারের উদয় হতে পারে। দ্বিতীয় ধাপ, অর্থাৎ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম শান্ত করা হয়ত সহজতর হবে। তার কারণ প্রথম ধাপটার সাফল্যলাভ এখনও সুদূরপরাহত এবং আত্মবোধাত্মক চেতনারও এখন পর্যন্ত একটা শক্তিশালী আবেদন থেকে গেছে। আমরা প্রত্যেকে নতুন নতুন বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রকে ভয় পাচ্ছি, তাই এই ভীতি হয়ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপনে আমাদের প্রণোদিত করতে পারে। আমরা যদি মৌমাছি, পিঁপড়ে বা ল্যাকেডেমোনীয়ন (Lacedaemonian) যোদ্ধা হতাম, যাদের ব্যক্তিগত ভয় বলে কিছুর অস্তিত্বই নেই আর কাপুরুষতা যাদের কাছে জগতের সবচেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার, তবে যুদ্ধ চলতেই থাকত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা শুধু মানুষ এবং কাপুরুষ।

এই পরিচ্ছেদের বিবেচিত বিষয় এবং সিদ্ধান্তগুলি আমার বহুকালের সঙ্গী। ত্রিশ বছরেরও বেশিদিন এইসব নিয়ে ভাবছি। আমি কখনও এদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাইনি। কিন্তু এসব চিন্তা 'অর্জন করা চরিত্রের উত্তরাধিকার' বা লামার্কতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে পরিগণিত হয়ে পরিত্যক্ত হবে এই ভয়ে আমি ভীত ছিলাম। আমরা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। তবু, 'অর্জন করা চরিত্রের উত্তরাধিকার' না মানলেও, অর্থাৎ ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ গ্রহণ করলেও আমরা দেখতে পাই যে, বিবর্তনের ধারার ওপর শ্রেণীগোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্যবহারের একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে যেটা কিছুটা ছদ্ম লামার্কতত্ত্বের ভান-এর মত মনে হয়। জুলিয়ান হাক্সলের (Julian Huxley) মতবাদের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী অধ্যায়ে এর ব্যাখ্যা করব—অবশ্য সেটা লেখা হয়েছিল একটু অন্যরকম সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে, শুধু পূর্ববর্তী চিন্তার সমর্থনে লেখা হয়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বোধগম্যতার ভবিষ্যৎ

জীববিদ্যার একটি কানাগলি ?

জগৎটাকে বোঝার ব্যাপারে কোনো ভাবেই আমরা কোনো নিশ্চিত বা সর্বশেষ পর্যায়ে, একটা চূড়ান্ত বা পূর্ণতম পর্যায়ে পৌঁছেছি এমন মনে করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। তার মানে আমি শুধু একথা বলতে চাইছি না যে, আমাদের বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা, দর্শন অধ্যয়ন বা ধর্মানুশীলন প্রচেষ্টা আরও বাড়িয়ে চললেই আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু বিস্তৃতি বা উন্নতি ঘটবে। প্রোটাগোরাস (Protagoras), ডেমোক্রিটাস (Democritus), অ্যান্টিস্থেনিস (Antesthenis)-এর সময় থেকে এতদিন পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি সেই পরিমাপে হিসেব করে আগামী আড়াই সহস্র বছরেও আমাদের যা পাওয়া সম্ভব তাও আমি যা বলতে চাইছি তার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ। এ কথা ভাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, আমাদের মস্তিষ্কই সর্বশ্রেষ্ঠ (ne plus ultra) চিন্তার যন্ত্র যাতে জগৎ প্রতিফলিত হচ্ছে। এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে অন্য কোনো প্রাণী হয়ত অনুরূপ আরও আশ্চর্য কৌশলযুক্ত যন্ত্র পেতে পারে। জগৎ প্রতিফলন ক্ষমতা সে যন্ত্রের হয়ত আমাদের তুলনায় বেশি—যেমন বেশি কুকুরের তুলনায় আমাদের, কিংবা শামুকের তুলনায় কুকুরের।

তাই যদি হয়, তবে তাত্ত্বিক বিচারে প্রাসঙ্গিক না হলেও ব্যক্তিগত কারণে জানতে আগ্রহ হয় যে, আমাদের পৃথিবীতে আমাদের সন্তানেরা বা আমাদের কারো কারো সন্তানেরা সেই ধরনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে কি না। পৃথিবীটা ঠিকই আছে। এটা স্বল্পকাল হল সাময়িকভাবে ভাড়া করা একটা সুন্দর বাসস্থান। সূচনা থেকে আমাদের বর্তমান অবস্থায় বিকাশ হতে যতটা সময় লেগেছে (ধরা যাক 1000 মিলিয়ন বছর) আরও ততকালই পৃথিবীটা প্রাণীর বাঁচার অনুকূল পরিবেশ বজায় রেখে চলবে। কিন্তু আমরা নিজেরা কি ঠিক আছি ? যদি বর্তমানের বিবর্তন তত্ত্ব মেনে নেওয়া যায়—যার চেয়ে ভাল তত্ত্ব আমাদের কাছে এখনও নেই—

তাতে মনে হবে আমরা ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। এখনও কি মানুষের পক্ষে দৈহিক বিবর্তন আশা করা সম্ভব ? অর্থাৎ দেহের এমন পরিবর্তন, যা বংশানুক্রমে স্থিত হবে, যেমন আমাদের দৈহিক সত্তা উত্তরাধিকার সূত্রে স্থিত হয়েছে, তেমনি পরিবর্তন, যাকে জীববিদ্যার ভাষায় জেনোটাইপিক্যাল (genotypical) বা জিন বৈশিষ্ট্যে স্থিত পরিবর্তন বলা হয় ? এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন। আমরা হয়ত একটা কানাগলির শেষে পৌঁছেছি। এমন কি হয়ত আমরা পৌঁছেও গিয়েছি। এটা একটা কিছু অসাধারণ ঘটনা হবে না এবং এর মানে আমাদের প্রজাতি খুব শীঘ্র লুপ্ত হবে এমনও নয়। ভূতাত্ত্বিক তথ্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কিছু কিছু প্রাণী বা জীবজগতের একটা বড় গোষ্ঠী পর্যন্ত বহুদিন আগেই বিবর্তনের সম্ভাবনার শেষ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু তবু তাদের বিনাশ ঘটে নি। অনেক মিলিয়ন বছর ধরে তারা অপরিবর্তিত বা অতি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে টিকে রয়েছে। যেমন কচ্ছপ ও কুমীর এইরকম অতি প্রাচীন প্রাণী গোষ্ঠী, অতি প্রাচীনকালের নিদর্শন। আমরা একথাও জেনেছি কীটপতঙ্গের বিরাট গোষ্ঠীও একই পথের পথিক। বাকী জীবজগতের সমস্ত প্রজাতির মোট সংখ্যার চেয়ে এদের বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা আরও বেশি। কিন্তু গত অনেক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) বছরেও তাদের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। অথচ ভূ-পৃষ্ঠের ওপর জীবজগতের বাকী অংশের এই সময়ের মধ্যে এত পরিবর্তন হয়েছে যে, তাদের পরিবর্তিত চেহারাকে আদিম চেহারার বিবর্তিত অবস্থা বলে চেনাই যায় না। কীটপতঙ্গের বিবর্তনের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবার কারণ হল বোধহয় এই যে, তারা দেহের কঙ্কালটা বাইরে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে (আলঙ্কারিক অর্থকে ভুল বুঝবেন না) আমাদের মত দেহের অভ্যন্তরে নয়। এই বাইরের বর্ম যদিও তাদের বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে সুস্থিত করেছে, কিন্তু এ বর্ম স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত হাড়কে জন্ম থেকে পূর্ণাঙ্গ শরীর গঠন পর্যন্ত বাড়তে দিতে পারে না। এই রকম পরিস্থিতিতে প্রাণীর ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পরিবর্তন প্রক্রিয়া দুঃসাধ্য হতে বাধ্য।

মানুষের ক্ষেত্রে বিবর্তনের পথে আর অগ্রসর হবার প্রতিকূলে নানা যুক্তি আছে বলে মনে হয়। ডারউইন তত্ত্ব অনুযায়ী মিউটেশন (mutation) অর্থাৎ বংশানুক্রমে চালিত হবার উপযুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনগুলির মধ্যে শুধু 'সুবিধাজনক'গুলি

স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হয়ে যাওয়াটা বিবর্তনের শুধু একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ধাপ, যাতে সামান্যমাত্র সুবিধা হয়। তাই ডারউইন তত্ত্ব গড়ে তোলার পথে অজস্র সন্তান উৎপাদনের থেকে সামান্য অংশ বেঁচে থাকার ঘটনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ এইভাবেই একটা উন্নতির ছোট ধাপের টিকে থাকার সম্ভাবনা কার্যত সফল হতে পারে। এই সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি সভ্য মানুষের ক্ষেত্রে রুদ্ধ হয়ে গেছে। মনে হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে উল্টোপথে চালিত হয়েছে। আমরা সাধারণত আমাদের সমগোত্রীয় জীবদের বিনষ্ট হওয়া বা কষ্ট পাওয়া দেখতে চাই না। তাই আমরা ধীরে ধীরে নানা রকম আইন প্রণয়ন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছি, যেগুলি একদিকে যেমন জীবনরক্ষা করে, শিশুহত্যার রীতি নিন্দা করে, প্রত্যেকটি দুর্বল মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে, অপরদিকে তেমনি সন্তান সংখ্যাকে জীবন ধারণের রসদের সরবরাহ অনুযায়ী সীমিত করে, কম উপযুক্ত মানুষের অপসরণের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী স্থান দখল করে নেয়। কখনও সোজাসুজি জন্মনিয়ন্ত্রণ করে, কখনও বা অনেক নারীকে যৌন মিলন থেকে নিরস্ত করে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ভালভাবেই জানা আছে, যুদ্ধের উন্মত্ততার পথ বেয়ে যে সব বিধ্বংসী ফলাফল আসে সেগুলি জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে। লক্ষ লক্ষ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী অনাহারে, আশ্রয়ের অভাবে ও মহামারীতে প্রাণ হারাচ্ছে। অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন ছোট ছোট উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধের একটা ফলপ্রসূ নির্বাচনী মূল্য ছিল। ঐতি-হাসিক যুগে যুদ্ধের তেমন কোনো মূল্য ছিল কিনা সন্দেহ আছে এবং বর্তমান যুগে তা নিঃসন্দেহে আদৌ নেই। ফলত যেমন নির্বিচারে প্রাণহানি ঘটছে তেমনি ওষুধ ও শল্য চিকিৎসার উন্নতি নির্বিচারে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। যুদ্ধ এবং চিকিৎসা কৌশল আমাদের বিচারে সঙ্গত কারণেই পরস্পর বিরোধী হলেও উপযুক্ত নির্বাচনের দিক থেকে একইভাবে মূল্যহীন।

ডারউইন তত্ত্বের আপাত অন্ধকার দিক

এইসব বিবেচনা থেকে মনে হয় যে, একটা বিকাশশীল প্রজাতি হিসাবে আমরা একটা স্থির অবস্থায় এসে পৌঁছেছি এবং আমাদের আরও জৈবিক অগ্রগতির আশা খুবই কম। এ কথা সত্যি হলেও আমাদের বিশেষ উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন

নেই। আমরা কোনো জৈবিক পরিবর্তন ছাড়াই কুমীর বা অসংখ্য কীটপতঙ্গের মত আরও লক্ষ লক্ষ বছর হয়ত টিকে থাকতে পারব। কিন্তু কিছু কিছু দার্শনিক বিচারে এই ধারণা বিষাদব্যঞ্জক। এর বিপক্ষে কিছু নজিরের অবতারণার প্রচেষ্টা করতে চাই। সেজন্য বিবর্তনবাদের একটা বিশেষ দিকের কথা আলোচনা করব। অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলে বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে* এই মত সমর্থন করেছেন, যার মূল্য বর্তমানযুগের বিবর্তনবাদীরা যথেষ্ট উপলব্ধি করছেন না বলে তিনি মনে করেন।

ডারউইন তত্ত্ব যেভাবে জনসাধারণের কাছে প্রচলিত আছে তাতে বিবর্তনের পথে প্রাণীর নিজস্ব ভূমিকার আপাত নিষ্ক্রিয়তা একটা অন্ধকারাছন্ন হতাশার দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে নিয়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্ত জিনম (genom) বা বংশগতি নির্ণায়কে মিউটেশন ঘটে। আমাদের এমন প্রমাণ আছে যার জোরে বলা যায় যে, পদার্থবিদরা যাকে তাপগতিজনিত চাঞ্চল্য বলেন, এই ঘটনা সেই কারণেই ঘটে। অর্থাৎ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত আকস্মিক ঘটনা। পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বংশানুক্রমিক চরিত্রসম্পদ অথবা সন্তানকে যে বংশধারা দিয়ে যাচ্ছে তার ওপর একজন ব্যক্তির নিজস্ব কোনো প্রভাব থাকছে না। যে সব স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন ঘটছে তার ওপর 'প্রাকৃতিক সঙ্গতি সাধনে শ্রেষ্ঠ' বিবেচিতগুলি নির্বাচিত হয়ে বেঁচে থাকছে। এটাও বিশুদ্ধ আকস্মিক ঘটনা নির্ভর। কারণ একটা অনুকূল মিউটেশন ঘটলে সেই ব্যক্তির টিকে যাবার এবং সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা বাড়বে এবং সন্তানের মধ্যে সেই মিউটেশনের ধারা সঞ্চারিত হবে। এ ছাড়া তার জীবনের নানা কার্যকলাপ জৈবিক দিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক। এসব তার সন্তানের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। জীবনে অর্জিত যে কোনো দক্ষতা বা শিক্ষা হারিয়ে যাবে, কোনো চিহ্ন রেখে যাবে না। ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সবেরও মৃত্যু হবে। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন অবস্থায় পড়ে ভাববেন যে, প্রকৃতি তাঁর সঙ্গে যেন অসহযোগ করছেন। নিজেই সব কিছু করছেন। ব্যক্তিকে নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে তাকে নাশ করছেন।

এ কথা সুবিদিত যে, ডারউইনের তত্ত্বই প্রথম সুসংবদ্ধ বিবর্তনতত্ত্ব নয়। এর আগে লামার্ক (Lamark) তাঁর বিবর্তনতত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। একজন

*Evolution : A modern synthesis (George Allen & Urwin, 1942)

ব্যক্তি তাঁর সন্তান উৎপাদনের পূর্বে নিজের জীবনের বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গীত সাধন করতে গিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযুক্ত ব্যবহার করে তাঁর আকৃতিতে যদি কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকেন তা হলে সেই বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে প্রবাহিত হয়, এই ধারণায় লামার্কতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাই পাথুরে বা বালুকাময় জমিতে বাস করে কোনো প্রাণীর পায়ের তলায় যদি ঘর্ষণ প্রতিরোধকারী শক্ত কড়া পড়ে তবে তা ধীরে ধীরে বংশধারায় প্রবাহযোগ্য হয়ে যাবে। তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের প্রাণীরা অর্জন করার পরিশ্রম ছাড়াই বিনামূল্যে তা উপহাররূপে পাবে। একই উপায়ে কোনো অঙ্গের কোনো কারণে ক্রমাগত বিশেষভাবে ব্যবহারের ফলে বা পরিবেশের সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টায় যদি কোনো বিশেষ দক্ষতা বা মানিয়ে নেবার ক্ষমতা আয়ত্ত হয় তবে তা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে না। অন্তত আংশিকভাবে তা সন্তানের কাছে পৌঁছবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাণিজগতের অতি বিচিত্র ও বিশিষ্টভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহারের আশ্চর্য বৈচিত্র্যের কারণ বোঝার একটা সহজ উপায় নির্দেশ করে। তা ছাড়া এ তত্ত্ব সুন্দর, উৎসাহব্যঞ্জক প্রাণবন্ত এবং আশার উদ্রেক করে। ডারউইন তত্ত্ব যে আপাত নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের আভাস দিয়েছে এ তত্ত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যিনি বিবর্তনের বিস্তীর্ণ ধারায় নিজেকে একটা যোগসূত্র বলে মনে করেন, তাঁর শরীর-মনের উন্নতি সাধনের আজীবন চেষ্টার জৈবিক বিলুপ্তি ঘটবে না, সমগ্র জাতির ক্রমোন্নতি ক্রমশঃ ত্রুটিমুক্ত করে উৎকর্ষ সাধনের পথে সামান্য হলেও অবিচ্ছেদ্য অংশ গ্রহণ করবেন এই আশ্বাস তিনি লামার্কতত্ত্ব থেকে পাবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় লামার্কতত্ত্ব সমর্থনযোগ্য নয়। অর্জিত গুণের বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারের যে ধারণার ওপর এর প্রধান ভিত্তি তা ভ্রান্তিপূর্ণ। আমাদের সমগ্র জ্ঞান পরিক্রমা করে জানা আছে যে, তা হতে পারে না। বিবর্তনের প্রত্যেকটি ধাপ স্বতঃস্ফূর্ত আকস্মিক মিউটেশন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির জীবনের নিজস্ব ব্যবহারের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধই নেই। সুতরাং আমরা ডারউইনতত্ত্বের সেই হতাশার দিকেই গিয়ে পড়ছি। এ সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করেছি।

আচরণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করে

আমি এখন দেখাতে চাই যে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এ রকম নয়। ডারউইন তত্ত্বের মূল ধারণাগুলি পরিবর্তন না করেও দেখানো যেতে পারে যে, ব্যক্তির ব্যবহার এবং

যেভাবে সে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি কাজে লাগাচ্ছে, বিবর্তনের পথে তার একটা কার্যকরী বা বলা যায় সবচেয়ে কার্যকরী প্রভাব আছে। যথা, যে কোনো অঙ্গ, চরিত্রের কোনো বিশিষ্ট গুণ বা শারীরিক গঠনের কোনো বিশিষ্ট গুণ বা ক্ষমতা সার্থকভাবে প্রয়োগ করার সঙ্গে সেই গুণগুলির সেই বিশিষ্ট কাজের পক্ষে ক্রমশ আরও সুবিধাজনক ভাবে উন্নত করে তোলার একটা অনস্বীকার্য আপাত সম্বন্ধ আছে। আমার মতে কোনো গুণের ব্যবহার হওয়া ও তার ক্রমোন্নতি সাধনের মধ্যে এই যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া লামার্ক-এর একটি অত্যন্ত সত্যজ্ঞান এবং তা বর্তমানের ডারউইন দৃষ্টিকোণের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু ডারউইনতত্ত্বকে অগভীরভাবে অনুশীলন করলে এ সত্য অলক্ষ্যে থেকে যাবে। ঘটনাক্রম এমনভাবে চলছে যাতে মনে হবে যেন লামার্ক তত্ত্বই সত্য। কিন্তু যে 'পদ্ধতি' অনুসরণ করে চলছে তা লামার্ক যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক জটিল। এ বক্তব্য ব্যাখ্যা করা বা অনুধাবন করা সহজ নয়, তাই আগেই সংক্ষিপ্ত ভাবে ফলাফলটা লিখে ফেলা সুবিধাজনক হবে মনে হয়। একটা বিশেষ অঙ্গের উদাহরণ দিয়ে শুরু করলে হয়ত বক্তব্য স্পষ্ট হবে। যদিও যে কোনো গুণ, অভ্যাস, কৌশল বা ব্যবহার অথবা সে সবের সামান্য কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এ বিশ্লেষণ প্রযোজ্য। লামার্ক ভেবেছিলেন যে, এই অঙ্গ (ক) ব্যবহৃত হল, (খ) তাই উন্নত হল, (গ) সে উন্নতি সন্তানের কাছে প্রবাহিত হল। এটা ভ্রান্ত ধারণা। আমাদের ভাবতে হবে (ক) অঙ্গটিতে আকস্মিক পরিবর্তন হচ্ছে, (খ) তার মধ্যে যেগুলি সুবিধাজনক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সব নির্বাচিত হয়ে জমছে বা নির্বাচনের দরুন অন্তত শক্তিশালী হচ্ছে, (গ) এই ব্যাপারটা প্রজন্মপরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে নির্বাচিত মিউটেশন একটা স্থায়ী উন্নতিতে পরিণত হচ্ছে। ঘটনাপর্যায়ের সূচনার প্রাথমিক পরিবর্তনগুলি যখন প্রকৃত মিউটেশন হয় না, অর্থাৎ তখন পর্যন্ত বংশধারায় প্রবাহযোগ্য হয় না, সে ক্ষেত্রেই লামার্কতত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুকরণ দেখা যায় বলে জুলিয়ন হাক্সলে মনে করেন। সেই সব পরিবর্তনগুলি যদি ফলপ্রসূ হয় তবে হাক্সলের ভাষায় জৈব নির্বাচন (organic selection) পদ্ধতিতে প্রাধান্য পেয়ে যেন প্রকৃত মিউটেশনের আগমনের পথ সুগম করে দেয়, যাতে ঘটনাক্রমে বাহিত অভিমুখ ঘটলে তৎক্ষণাৎ প্রকৃত মিউটেশনে সে সব গৃহীত হয়।

এবার একটু বিশদ করে এ বিষয়ে বলা যাক। সর্বপ্রধান লক্ষণীয় ব্যাপার হল কোনো পরিবর্তনের ফলে একটি প্রাণী যদি কোনো একটা নতুন শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা তার সামান্য রূপান্তর অর্জন করে, তা মিউটেশন বা মিউটেশন ও কিছুটা নির্বাচনের সম্মিলিত প্রভাব ইত্যাদি যে ভাবেই পেয়ে থাকুক না কেন, তা প্রাণীটিকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেবার মত ক্রিয়াকলাপে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সুতরাং নির্বাচন পদ্ধতি তাকে আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করবে। এই নতুন বা পরিবর্তিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করে ব্যক্তি তার পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারে। পারি-পার্শ্বিকের বাস্তব পরিবর্তন ঘটিয়ে অথবা স্থানত্যাগ করে, কিম্বা পরিপার্শ্বের সঙ্গে তার আচরণ পরিবর্তন করে। এ সবই তার নতুন পাওয়া চরিত্রের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেবে এবং তার নির্বাচনভিত্তিক ক্রমোন্নতি এক মুখীভাবে ত্বরান্বিত করবে।

এই দৃঢ় ঘোষণা হয়ত খুব দুঃসাহসিক মনে হতে পারে, কারণ তা ব্যক্তির একটা উদ্দেশ্য এবং অতিরিক্ত বুদ্ধির আবশ্যকতা দাবী করে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, যদিও আমার বক্তব্যে উচ্চতর প্রাণীর উদ্দেশ্য ও বুদ্ধির ভূমিকাও আছে, কিন্তু শুধু তাদের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা প্রযোজ্য নয়। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

একটি গোষ্ঠীর প্রাণীরা সকলেই এক পরিবেশে থাকে না। এক প্রজাতির বুনোফুল ছায়াতে, রোদে, উঁচু পাহাড়ের ঢালে কিম্বা নিচের উপত্যকাতে জন্মায়। একটা বিশেষ মিউটেশন—যেমন লোমশ পাতা উঁচু জায়গার পক্ষে সুবিধাজনক বলে নির্বাচনে পাহাড়ে পক্ষপাতিত্ব পাবে, কিন্তু নিচের উপত্যকাতে তা লোপ পায়। ফলাফল যা হল তাতে মনে হবে যেন যাদের লোমশ মিউটেশন ঘটেছে তারা এমন পরিবেশে চলে গেল যে স্থান একই অভিমুখে তাদের বেড়ে ওঠার অনুকূল হয়।

আর একটি উদাহরণ : পাখিদের ওড়ার ক্ষমতার দরুন তারা গাছের উচু ডালে বাসা বানায়, যেখানে তাদের শাবকেরা বিশেষ বিশেষ শত্রুদের আক্রমণের নাগালের অপেক্ষাকৃত বাইরে থাকে। যারা গোড়াতেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তারা নির্বাচনের দিক থেকে বিশেষ সুবিধা পেয়েছে। দ্বিতীয় ধাপ হল শাবকদের মধ্যে যারা ভাল উড়তে পারে তারাই এই ধরনের বাসার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত হবে। সুতরাং উড়তে পারার একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা একটা পরিবেশ পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বা পরিবেশের প্রতি এমন ব্যবহার ঘটাচ্ছে যা সেই ক্ষমতাটা বাড়াতে সাহায্য করে।

প্রাণীদের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য হল যে, তারা নানা প্রজাতিতে বিভক্ত, যাদের অনেকেই অবিশ্বাস্যরকম বিশিষ্ট কলাকৌশলে পারদর্শী এবং তার ওপর তাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে। চিড়িয়াখানা প্রায় একটা আজব সংগ্রহশালা—কীটপতঙ্গের জীবন-ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকলে যা আরও বৈচিত্রপূর্ণ হত। জীবজগতে বিশিষ্ট দক্ষতার অভাব থাকাটাই ব্যতিক্রম। প্রাণীর গঠনের সাধারণ নিয়মই হল এমন সব নানা অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠা যা 'প্রকৃতি' তৈরি না করলে কেউ কল্পনাও করতে পারত না। এ সব কিছুই ডারউইনীয় 'আকস্মিক পরিবর্তন পুঞ্জীভবন' এর ফলেই হয়েছে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। মানতে ইচ্ছে না হলেও একটা ধারণা মনে আসে যে, একটা শক্তি বা প্রবণতা যেন 'সহজ সরল' থেকে একটা নির্দিষ্ট জটিলতার দিকে চালিত করছে। মনে হয় 'সহজ সরল' একটা অস্থিত অবস্থা, এ অবস্থা থেকে বিচ্যুতি যেন একই অভিমুখে আরও বিচ্যুতি ঘটানোর শক্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করছে। ডারউইনের প্রাথমিক কল্পনা অনুযায়ী যদি কোনো কৌশল, কারিগরী, অঙ্গ বা সুবিধাজনক আচরণ ইত্যাদির উদ্ভবকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ঘটনার সূত্রে গাঁথা বলে ভাবা হয় তবে এ ব্যাপারটা বোঝা শক্ত। আমার মনে হয়, বস্তুত একটা 'বিশেষ অভিমুখী' পরিবর্তনের শুরু এই প্রক্রিয়ায় হয়। তারপর এই পরিবর্তন নিজেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা 'নমনীয় বস্তুতে হাতুড়ি পিটে' প্রথম পাওয়া সুবিধার অনুকূল অভিমুখে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে আরও সুসংবদ্ধভাবে চলতে থাকে। রূপকাকারে বলা যায়, এক একটি প্রজাতি তার প্রাণধারণের সম্ভাব্য পথ কোন্ দিকে তা খুঁজে পেয়ে সেই পথ অনুসরণ করে।

লামার্কতত্ত্বের ভান

যে আকস্মিক মিউটেশন ব্যক্তিকে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে বাঁচার সুযোগ দেয় তা কি করে আরও বেশি কিছু কাজ করে—যেমন পরিবর্তনটার ফলপ্রসূ ভাবে ব্যবহারের সুযোগ বাড়িয়ে দিয়ে তার ওপর নির্বাচনের প্রভাব পুঞ্জীভূত করে তা সাধারণভাবে বোঝার এবং সেই প্রক্রিয়ার সর্বপ্রাণবাদ (animistic) বহির্ভূত একটা নিয়মের সূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করব।

এই পদ্ধতি বোঝার জন্য পরিবেশকে সুবিধাজনক এবং অসুবিধাজনক এই দুই ধরনের অবস্থার সমাবেশ বলে ভাবা যাক। প্রথম ভাগের উপাদান খাদ্য, পানীয়,

আশ্রয়, সূর্যালোক ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় ভাগের—অন্যান্য প্রাণীর (শত্রুর) আক্রমণ আশঙ্কা, বিষ, নানা আদিম প্রকৃতির রূক্ষতা ইত্যাদি। সংক্ষেপে প্রথম শ্রেণীকে প্রয়োজন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে 'প্রতিপক্ষ' বলা যাক। সব 'প্রয়োজন' মেটানো যায় না, সব 'প্রতিপক্ষ'কে এড়ানো যায় না। কিন্তু জীবিত প্রাণীরা নিশ্চয়ই সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিপক্ষকে এড়ানোর এবং সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন সবচেয়ে সহজলভ্য উৎস থেকে পাবার উপযুক্ত আচরণ আয়ত্ত করার মধ্যে সঙ্গতিসাধন করে, যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে। একটা সুবিধাজনক মিউটেশন কিছু প্রয়োজনের উৎসকে সহজলভ্য করে দেয় কিম্বা কিছু প্রতিপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা কমিয়ে দেয় অথবা দুটোই একযোগে ঘটায়। এইভাবে সেইসব মিউটেশন সম্বলিত প্রাণীদের বাঁচার সম্ভাবনা সেই মিউটেশন বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া প্রতিপক্ষ এবং প্রয়োজনের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিবর্তন করার ফলে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ ভারসাম্যের অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। যে কজন প্রাণী আকস্মিক কারণে বা বুদ্ধির জোরে এই সুবিধার সুযোগ নিয়ে তা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে তারাই নির্বাচিত হয়। এই পরিবর্তন সোজাসুজি জিনম (genom) বা বংশগতির দৈহিক উপাদান বাহিত ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই পরিবর্তন প্রবাহিত হবে না। সবচেয়ে সহজ ও আদিম উদাহরণ পাওয়া যাবে সেই লোমশ মিউটেশনযুক্ত ফুলের (যা উচু পাহাড়ের ঢালে জন্মায়) প্রজাতির ক্ষেত্রে। এই ফুল পাহাড়ের সবচেয়ে উচু জায়গায় বিকশিত হবার উপযুক্ত, তাই সেখানেই তা বীজ ছড়িয়ে পরবর্তী 'লোমশ' প্রজন্মের জন্ম দেয়, যাতে মনে হয় লোমশ-জাতীয় ফুল যেন তাদের পক্ষে পক্ষপাতী 'মিউটেশনের আরও উপযুক্ত ব্যবহার' করার জন্য 'পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে।'

মনে রাখতে হবে যে, এই সমস্ত পরিস্থিতির গতি অত্যন্ত দ্রুত এবং জীবন যুদ্ধ অত্যন্ত কঠিন। একটা মোটামুটি বহুসন্তানপ্রসূ প্রাণীগোষ্ঠী যদি যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি না হয়ে বেঁচে থাকে তাহলে সাধারণত তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু তাদের বিরোধী শত্রুপক্ষের অধিক শক্তির দ্বারা পরাভূত হয়। তখন সেই গোষ্ঠীর কারো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। কখনও বা 'প্রয়োজন' ও 'শত্রুপক্ষ' একসঙ্গে যুক্ত থাকে। সে ক্ষেত্রে একটা অপরিহার্য প্রয়োজন শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে পেতে হয় (যেমন নীল গাইয়ের নদীতে জল খেতে যেতে হয়, কিন্তু সিংহও সে জায়গাটা

তার মতই চেনে)। 'প্রয়োজন' ও 'প্রতিপক্ষ'-এর সম্পূর্ণ পরিমণ্ডল জটিল বুনোটে সাজানো। কোনো প্রাণীর কোনো মিউটেশন যদি কোনো বিপদকে সামান্য একটু কমাতে পারে তাহলে সেই মিউটেশন প্রাপ্ত প্রাণীরা সেই বিপদ জয় করতে পারবে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিপদও এড়াতে পারবে এবং এটা তাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনবে। ফলে শুধু জন্মসূত্রবাহী (genetic) পরিবর্তনই নয়, তার ব্যবহার দক্ষতারও (উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং উদ্দেশ্যবিহীন) নির্বাচনী ক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তান সেই ব্যবহার দক্ষতা পাবে উদাহরণ দেখে, অর্থাৎ 'শিক্ষা' বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তার মাধ্যমে। ব্যবহারের এই নতুন পরিবর্তন আবার সেই বিশিষ্ট দিকে মিউটেশনের নির্বাচনী মূল্য বাড়িয়ে দেবে।

লামার্ক-কল্পিত পদ্ধতির চিত্রের সঙ্গে এইরকম দৃশ্যপরম্পরায় অনেক মিল আছে। যদিও কোনো অর্জিত আচরণ ও তার অনুগামী শারীরিক পরিবর্তন সন্তানের কাছে প্রত্যক্ষভাবে জন্মসূত্রে প্রবাহিত হয় না, তবু ঘটনাপ্রবাহের উপর পূর্বপ্রজন্মের ব্যক্তির আচরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যদিও যে কার্যকারণের যোগাযোগ প্রতীয়মান হয় তা লামার্ক-এর চিন্তাধারা অনুযায়ী নয়, বরং তার বিপরীতমুখী। পিতামাতার আচার-আচরণের আনুষঙ্গিক শারীরিক পরিবর্তন ঘটে এবং তা সন্তান জৈবিক উত্তরাধিকারসূত্রে পায় এ কথা ঠিক নয়। পিতামাতার শারীরিক পরিবর্তনই নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে ; আচরণের এই পরিবর্তন দৃষ্টান্ত, শিক্ষা কিম্বা আরও আদি উপায়ে জিনম-এর ভৌত পরিবর্তনের সঙ্গে সন্তানে প্রবাহিত হয়। যদি শারীরিক পরিবর্তন তখনও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবাহযোগ্য না-ও হয় তবু শিক্ষার মাধ্যমে আরোপিত আচরণের প্রবাহ বিবর্তনের পক্ষে একটা অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি হতে পারে। কারণ পরবর্তী কালে বংশধারায় প্রবাহযোগ্য অনুরূপ মিউটেশন ঘটলে এই প্রস্তুতি সেই পরিবর্তনের মাধ্যমে আরও কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে তার নির্বাচিত হবার শক্তিকে বিশেষ ভাবে বাড়িয়ে দেয়।

আচরণ ও দক্ষতার বংশানুক্রমিক স্থিতি

যে কার্যকারণ প্রণালীর বিবরণ দেওয়া হল সে সম্বন্ধে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, এমন ঘটনাপরম্পরা মাঝে মাঝে ঘটতে পারে কিন্তু তা পরিবেশের সঙ্গে

সঙ্গতিসাধনভিত্তিক বিবর্তনের পক্ষে একটা অপরিহার্য প্রণালীরূপে অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না। কারণ আচরণের পরিবর্তন তো শারীরিক বংশগতির উপাদান উত্তরাধিকারের সঙ্গে, বা উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণকারী ক্রোমোজোম (chromosome)-এর মাধ্যমে পরিবাহিত হয় না। সুতরাং প্রথমে তা বংশগতিতে স্থিত হয় না এবং পরেই বা কি প্রক্রিয়ায় তা বংশানুক্রমিক উপাদানের অঙ্গীভূত হতে পারে তা বোঝা মুস্কিল। এটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কারণ আমরা জানি যে, অনেক অভ্যাস উত্তরাধিকারসূত্রে প্রবাহিত হয়। যেমন—পাখিদের বাসা বানানো, কুকুর-বেড়ালের পরিষ্কার থাকার নানা রকম অভ্যাস ইত্যাদি সাধারণভাবে চোখে পড়ার মত কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যদি রক্ষণশীল ডারউইনীয় ধারায় এসব ব্যাখ্যা না করা যায় তবে সেই ডারউইনবাদ বর্জন করতে হবে। এই প্রশ্নটা মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা বিশেষ তাৎপর্যমূলক। কারণ আমরা সিদ্ধান্ত করতে চাইছি যে, মানুষের সারাজীবনের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা তার প্রজাতির ক্রমবর্ধমান উন্নতি সাধনে জৈবিক পরিপ্রেক্ষিতে গঠনমূলক কিছু উপাদান প্রদান করবে। পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপ বলে আমি মনে করি।

আমাদের অনুমান অনুযায়ী মনে হয় আচরণ শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে, সূচনায় দেহের একটা আকস্মিক পরিবর্তনের ফলেই, কিন্তু তারপর অতি শীঘ্র সেই পরিবর্তন নির্বাচনী পদ্ধতিকে একটা বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করে। কারণ আচরণ যে প্রাথমিক সামান্য পরিবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করে প্রস্তুত হয়েছে, ভবিষ্যতে শুধুমাত্র সেই অভিমুখী মিউটেশনেরই নির্বাচনী মূল্য রয়েছে। কিন্তু বলা যায়, নতুন অঙ্গ যেই বিকাশলাভ করে সেই অঙ্গের কেবলমাত্র অস্তিত্বের জন্যই আচরণ সেই অঙ্গের সঙ্গে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে। আচরণ এবং দৈহিক গঠন একীভূত হয়ে যায়। উপযুক্ত কার্যক্ষম একজোড়া হাত পেয়ে কেউ স্বীয় লক্ষ্য সাধনে তা ব্যবহার করবেন না এমন হতেই পারে না। নইলে সেই হাত দুটি বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে (যেমন হয়ে থাকে আনাড়ী অভিনেতা মঞ্চে উঠলে—কারণ তার সঠিক কোনো উদ্দেশ্য থাকে না)। কারো সক্ষম ডানা থাকবে অথচ সে উড়তে চেষ্টা করবে না তা হতেই পারে না। একজনের ধ্বনি সৃষ্টি করে কথা বলার মত নিয়ন্ত্রণযোগ্য অঙ্গ থাকবে অথচ সে পারিপার্শ্বে যে সব শব্দ শুনতে পাচ্ছে তা নকল করার চেষ্টা করবে না তা হতে পারে না। প্রাণীর একটা অঙ্গের অস্তিত্ব

ও তা ব্যবহার করার তাগিদ এবং অভ্যাস করে তার ক্ষমতা বাড়াবার প্রবণতাকে প্রাণীর দুটি বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য বলে ভাবাটা একটা কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করা—প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ স্বাভাবিক বিভাজন নয়। এ বিভাজন শুধু বিমূর্ত ভাষার সাহায্যেই করা সম্ভব। প্রকৃতিতে তার কোনো প্রতিরূপ নেই। আমরা অবশ্যই ভাবব না যে, 'আচরণ' ক্রমশ ক্রোমোজোমের গঠনে প্রবেশ করে সেখানেই অবস্থান করবে। নতুন অঙ্গগুলিই (বংশগতিতে যেগুলি স্থিত হয়) নিজেদের ব্যবহার করার পদ্ধতি বহন করে। প্রাণী যদি নতুন অঙ্গের সুষ্ঠু ব্যবহার করে নির্বাচনী পদ্ধতিকে সাহায্য না করত, নির্বাচন পদ্ধতি তাহলে নতুন অঙ্গ 'সৃষ্টি' করতে অক্ষম হত। এটাই সবচেয়ে মূলগত কথা। তাই এই দুটি ব্যাপার সমান্তরালভাবে চলে এবং অবশেষে —কিম্বা প্রকৃতপক্ষে প্রতি ধাপেই একযোগে মিলিতভাবে **'একটা ব্যবহৃত অঙ্গ'** এইরকম একটা রূপ ধরে জন্মগতভাবে স্থিত হয়। যেন লামার্কতত্ত্বে সত্যতা ছিল।

মানুষের নিজের হাতে কোনো যন্ত্র তৈরির সঙ্গে এই প্রাকৃতিক পদ্ধতির তুলনা করলে ব্যাপারটার ওপর আলোকপাত হবে। প্রথম দৃষ্টিতে এই দুই ঘটনার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বৈপরীত্য আছে মনে হবে। আমরা যদি কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করি তবে অধৈর্য হয়ে সম্পূর্ণ তৈরি হবার আগেই তা বার বার ব্যবহার করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নষ্ট হয়ে যাবে। মনে হয় প্রকৃতি অন্যরকমভাবে চলেন। ক্রমাগত ব্যবহার এবং তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ না করে প্রকৃতি কখনও একটা নতুন প্রাণী ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করতে পারেন না। কিন্তু আসলে এ তুলনা ভুল। মানুষের একটি যন্ত্র তৈরি অণ্টোজেনেসিস (ontogenesis) বা ভ্রূণ থেকে পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সঙ্গে তুলনীয়। এ ক্ষেত্রেও মধ্যপথে বাধাসৃষ্টি বাঞ্ছনীয় নয়। শিশুদের রক্ষা করতেই হবে, তাদের প্রজাতির পরিপূর্ণ শক্তি ও দক্ষতা অর্জন করার আগে তাদের কাজে নিযুক্ত করা চলবে না। বছরের পর বছর, দশকের পর দশক ধরে সাইকেলের ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিদর্শনগুলির একটা প্রদর্শনীর সঙ্গে প্রাণীর বিবর্তনের অগ্রগতির ধারা প্রকৃতপক্ষে তুলনীয় বলা যেতে পারে। রেল-গাড়ির ইঞ্জিন, মোটর গাড়ি, বিমান, টাইপরাইটার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ তুলনা প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক পদ্ধতির মতন এ ক্ষেত্রেও ক্রমোন্নতির জন্য যন্ত্রটির ব্যবহার আবশ্যিক। কেবলমাত্র আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে উন্নত হয়ে ওঠা নয়, ব্যবহারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পরিবর্তনের পরিকল্পনা প্রয়োগ করে উন্নত

করা। সাইকেল পূর্বে আলোচিত প্রাচীন প্রাণীর সঙ্গে তুলনীয়। যে প্রাণীর ক্ষেত্রে আয়ত্ত করার উপযুক্ত সব সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে বিবর্তনের পথে আর পরিবর্তন ঘটা বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ অব্যবহার্য হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

বুদ্ধিগত বিবর্তনের পথের সংকট

এখন আবার এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে ফিরে যাওয়া যাক। আমরা এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম, মানুষের আর জৈবিক বিকাশের সম্ভাবনা আছে কি? আমার মনে হয় আমাদের আলোচনা থেকে দুটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

প্রথম হল আচরণের জৈবিক গুরুত্ব। আচরণের যদিও উত্তরাধিকার ঘটে না, তবুও সহজাত ক্ষমতা এবং পরিবেশের সদ্ব্যবহার করা এবং এই দুইয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের মধ্য দিয়ে আচরণ জৈবিক বিবর্তনের গতিকে বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে। উদ্ভিদ এবং নিম্নশ্রেণীর জীবজগতে উপযুক্ত আচরণ খুব ধীরগতিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথে অর্থাৎ নানা পরীক্ষা করে ভুল সংশোধন করতে করতে বাছাই হয়ে গড়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের বিশেষ বুদ্ধির ফলে সে নিজের ইচ্ছায় উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি বেছে নিতে পারে। মন্থর এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রতুল বংশ বিস্তার এবং জীবনধারণের রসদ অনুযায়ী সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি হতে না দেওয়ার জৈবিক নিরিখে বিপজ্জনক ব্যবস্থাপনার ফলে তা আরও কমে যাবার অসুবিধাকে মানুষ তার এই অতিমাত্রার সুবিধার সাহায্যে সহজেই অতিক্রম করতে পারে।

দ্বিতীয় বিচার্য বিষয়, জৈবিক বিবর্তন মানুষের ক্ষেত্রে আর আশা করা যায় কিনা এ প্রশ্ন প্রথম আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা আসলে একভাবে এর সম্পূর্ণ উত্তরটা পেয়েই গিয়েছি। তা হল, ব্যাপারটা আমাদের ওপরই, এবং আমাদের কার্যকলাপের ওপরই নির্ভর করছে। আমরা কোনো কিছুর আগমনের প্রতীক্ষা করব না বা বিশ্বাস করব না যে আমাদের ভাগ্য অমোঘ অপরিবর্তনীয় নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হবে। আমরা যদি কিছু চাই তার জন্য চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। না চাইলে চেষ্টার দরকার নেই। যেমন রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনাবলীর বিকাশ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা ভাগ্যের সূতো বোনার মত করে আমাদের ওপর এসে পড়ে না, তা বেশিরভাগই আমাদের কর্মফল, তেমনি আমাদের জৈবিক জীবনযাত্রার ভবিষ্যৎ—যা বড় মাপের ইতিহাস ছাড়া

কিছুই নয়, তাও প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অপরিবর্তনীয় পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যরূপে আমরা মেনে নেব না। অন্তত আমাদের কাছে, অর্থাৎ যারা এই অনুষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, তাদের কাছে ব্যাপারটা এমন নয়। যদিও আমরা যেমন পাখিদের বা পিঁপড়েদের পর্যবেক্ষণ করি তেমনি কোনো উচ্চতর ব্যক্তি আমাদের পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর কাছে সেইরকমই মনে হত। ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ এবং বিস্তৃতভাবে একটা অমোঘ নিয়মে চলা পূর্বনিয়ন্ত্রিত অপরিবর্তনীয় ঘটনাবলী বলে মানুষ কি কারণে ভাবে তা বেশ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কারণটা হল এই যে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি অনুভব করে যে, যদি সে তার মতামত অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারে এবং তাদের আচরণ-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে প্ররোচিত করতে না পারে তবে ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে তার প্রভাব বিস্তার করার বিশেষ কোনো উপায় নেই।

আমাদের জৈবিক ভবিষ্যৎকে সুনির্দিষ্ট করতে হলে আমাদের কি রকম আচার ব্যবহার করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে একটা সাধারণ বক্তব্য পেশ করছি, যা আমি মূলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। আমার মতে বর্তমানে আমরা বিপজ্জনকভাবে 'সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছানর পথ'কে হারাতে চলেছি। যা কিছু আলোচনা হল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে জৈবিক বিবর্তনের পক্ষে নির্বাচন একটা অপরিহার্য উপাদান। যদি এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়, তবে বিকাশের অগ্রগতি শুধু থেমে যাবে তা নয় বিপরীতমুখেও চলে যেতে পারে। জুলিয়ন হাক্সলের ভাষায় '………… অধঃপতন-মূলক মিউটেশনের ফলে একটি অঙ্গের অধঃপতন ঘটলে সেটা অব্যবহার্য হয়ে পড়বে এবং নির্বাচন পদ্ধতি তার ওপর কাজ করে আর সেটার উৎকর্ষ বজায় রাখতে পারবে না।' আমার বিশ্বাস বেশিরভাগ যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকতা এবং 'বুদ্ধিহীন করে তোলা' অতি বিপজ্জনক ভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গের অবনতি ঘটাচ্ছে। কারুশিল্পকে দমন করে যতই একঘেয়ে নিয়মে সাজানো ক্লান্তিকর বোধহীন যান্ত্রিক প্রস্তুত প্রণালীর প্রবর্তন হবে, সংবেদনশীল, দক্ষ এবং অনুভূতিহীন মানুষের জীবনের সুযোগকে নির্বিশেষে একই পর্যায়ে ফেলে কারখানার সমান মাপের বৈশিষ্ট্যহীন তৈরি মাল জোড়া দেবার জন্য একই পঙক্তিতে বসিয়ে দেওয়া হবে, উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, উচ্চমানের সূক্ষ্ম কাজে দক্ষ হাত, সূক্ষ্মবোধ ও দৃষ্টিযুক্ত মানুষ ততই অপ্রয়োজনীয় এবং অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়বে। বস্তুত যারা বুদ্ধিহীন মানুষ, একঘেয়ে কাজে যাদের স্বাভাবিক প্রবণতা তারাই বিশেষ সুযোগ-সুবিধা

পাবে। তাদেরই বেড়ে ওঠা, নিশ্চিন্তভাবে স্থিত হওয়া, সন্তান উৎপাদন সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। ফলত ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে নৈতিমূলক নির্বাচনের মতই ব্যাপার ঘটবে।

আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের বাড়তি চাপের মধ্যে চলার ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে কর্মীদের কল্যাণের জন্য নানা সংস্থা গড়ে উঠেছে। এ সব সংস্থাগুলির লক্ষ্য হল শ্রমজীবীদের বেকারত্ব এবং অতিরিক্ত শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং অন্যান্য কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া। এইসব ব্যবস্থা সঙ্গতভাবেই কল্যাণ-মূলক বলা হয় এবং এই ব্যবস্থাগুলি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু একটা সত্য সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকা চলে না যে এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে নিজ দায়িত্ব বহন করা থেকে মুক্তি দিয়ে সব মানুষের সুযোগ সমানভাবে বণ্টন করে সহজাত ব্যক্তিগত বিশেষ দক্ষতার প্রতিযোগিতা লুপ্ত করার পথে চালিত করে জৈবিক বিবর্তনের গতিকে ভাল করে রুদ্ধ করা হচ্ছে। আমি জানি এই বিশেষ মতটি অত্যন্ত বিতর্কিত। কেউ বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থনে জোরালো যুক্তিতে বলতে পারেন যে, কল্যাণমূলক কাজে আমাদের প্রচেষ্টাই আমাদের বিবর্তনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাকে অতিক্রম করাতে পারবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রধান বক্তব্যের সঙ্গে এই কথাটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অভাবের পরেই আমাদের জীবনযাত্রার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হল একঘেয়েমি। আমরা যেসব আশ্চর্য যন্ত্র তৈরি করেছি তা দিয়ে ক্রমাগত আমরা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত নানা বিলাসের বস্তু সৃষ্টি না করে আমাদের এমনভাবে চিন্তা করা উচিত যাতে মানুষের কাছ থেকে সব কিছু বুদ্ধিহীন একঘেয়ে এবং যান্ত্রিক কাজের বোঝা যন্ত্রই নিয়ে নেয়। যন্ত্র সেইসব কাজ নিয়ে নিক যার পক্ষে মানুষ অতিরিক্ত ভাল ; মানুষকে যেন এমন কাজ দেওয়া না হয় যার জন্য যন্ত্র অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এর ফলে উৎপাদনের ব্যয় কমবে না কিন্তু যারা এ কর্মে লিপ্ত তারা আরও সুখী হবে। যতদিন সারা পৃথিবীতে বড় বড় ব্যবসায়ী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে, ততদিন এ প্রস্তাব সফল হবার আশা খুবই কম। কিন্তু এই ধরনের প্রতিযোগিতা যেমন নীরস, তেমনি জৈবিক দিক থেকে অসার্থক। এর বদলে বিভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে আগ্রহ-উদ্দীপক এবং বুদ্ধিবিকাশের প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উদ্দেশ্য হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বস্তুনিষ্ঠকরণের নীতি

ন' বছর আগে আমি দুটি সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করেছিলাম, যে দু'টি সূত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূলগত ভিত্তি গড়ে তুলেছে। একটি হল প্রকৃতির বোধগম্যতার সূত্র, অন্যটি বস্তুনিষ্ঠকরণের সূত্র। সেই সময় থেকে আমি প্রায়ই এ বিষয়ে কিছু-না-কিছু বলে চলেছি। আমার **Nature and Greeks** (Cambridge University Press 1954) নামে ছোট বইটিতে এ বিষয়ে লিখেছি। এখানে আমি দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠকরণের সূত্র বিষয়ে আলোচনা করব। এ কথায় কি বোঝাতে চাইছি তা বলার আগে আমি একটা ভুল বোঝার সম্ভাবনাকে দূর করতে চাই। বইটির নানা সমালোচনা পড়ে আমার এ কথা মনে হয়েছে। অথচ প্রথম থেকেই আমি এ সম্ভাবনাকে এড়াতে পেরেছিলাম বলে আমার ধারণা ছিল। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই : মনে হয় কেউ কেউ ভেবেছেন বিজ্ঞানের পদ্ধতির মূল সূত্র কি হওয়া উচিত বা যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিজ্ঞানের যা মূল ভিত্তি এবং যা মেনে চলতেই হবে তাই বিবৃত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। তা একেবারেই নয়—আমি শুধু মনে করেছি এবং এখনও মনে করি, এই সূত্রগুলি রয়েছে। এগুলি আমরা প্রাচীন গ্রীকদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি—যাদের কাছ থেকে পশ্চিম দেশের সব বৈজ্ঞানিক চিন্তা উদ্ভূত হয়েছে।

এই ভুল বোঝাটা খুব বেশি আশ্চর্যজনক নয়। একজন বিজ্ঞানী যদি বিজ্ঞানের মূলসূত্র হিসাবে দুটি সূত্রের ওপর বেশি জোর দেন তবে স্বভাবতই মনে হবে যে, তিনি অন্তত বিশেষভাবে সেই ধারণার পক্ষপাতী এবং অন্যের ওপর সেই মত তিনি চাপিয়ে দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু অপরপক্ষে, বিজ্ঞান কখনও কোনো মত চাপিয়ে দেয় না, একথাও সুবিদিত। বিজ্ঞান কেবলমাত্র বক্তব্য বিবৃত করে। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যতদূর জানা আছে তার যথাযথ সত্য বিবরণ দেওয়া ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। বিজ্ঞানী তাঁর নিজের এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীর ওপর মাত্র

দুটি শর্তই আরোপ করেন, তা হল সত্যনিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা। এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুই হল বিজ্ঞান—কিভাবে তা বিকাশলাভ করেছে এবং বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, তা কেমন হওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে কিভাবে বিকাশলাভ করা উচিত, তা নয়।

এখন সূত্র দুটি সম্বন্ধে ভেবে দেখা যাক। প্রথম সূত্র, 'প্রকৃতিকে বোঝা সম্ভব'—এ বিষয়ে দু'একটি কথা বলব। এ সূত্র যে আবিষ্কার করতে হয়েছে এবং এ সূত্র যে আবিষ্কার করার আদৌ প্রয়োজন ছিল এটাই হল সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার। মিলেশীয় চিন্তাধারা (Milesian School) অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীক প্রকৃতিবিজ্ঞানী (Physiologoi)-দের থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। সেই থেকে এই সূত্রকে স্পর্শ করা হয় নি, যদিও তা সব সময় অবিকৃত থাকে নি। পদার্থবিজ্ঞানের বর্তমান চিন্তাধারায় তা বিশেষভাবে দূষিত করা হয়েছে। প্রকৃতিতে কার্যকারণ সম্বন্ধের অভাবের নজির বলে অভিযুক্ত অনিশ্চয়তাবাদ এই সূত্র থেকে সরে যাবার পদক্ষেপ ফেলেছে বা আংশিকভাবে তাকে পরিত্যাগ করার সূচনা করেছে বলে মনে হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা করার আকর্ষণ অনুভব করলেও আমি এখানে অন্য সূত্রটি, অর্থাৎ যাকে আমি বস্তুনিষ্ঠকরণ বলছি সে সম্বন্ধে আলোচনাতেই মনোনিবেশ করতে চাইছি।

আমি যা বলতে চাইছি তাকে অনেক সময় আমাদের চারপাশের 'প্রকৃত জগতের প্রকল্প' বলা হয়। আমার মনে হয় এই সূত্রে প্রকৃতির অত্যন্ত জটিল সমস্যাগুলিকে আয়ত্তে আনার জন্য কিছুটা সরলীকরণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। আমরা সচেতন না হয়ে বা যথাযথ সুসংবদ্ধ চিন্তা না করে, যে প্রকৃতিকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি, আমাদের জ্ঞানশক্তির আধারকে সেই প্রকৃতির এলাকার বাইরে রাখছি। মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে আমরা বাইরের দর্শকের ভূমিকায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি যাতে সে জগতের অঙ্গীভূত থাকছে না, এবং এই প্রক্রিয়াতেই জগৎটা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত দু'টি পরিস্থিতির আড়ালে রয়েছে। প্রথমত, আমার নিজের শরীর (যার সঙ্গে আমার মানসিক কার্যকলাপ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত) আমার অনুভূতি, উপলব্ধি ও স্মৃতিশক্তির সাহায্যে যে বস্তু (আমার চারপাশের প্রকৃত জগৎ) আমি গড়ে তুলি তারই একটা অংশ। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য ব্যক্তিদের শরীরও সেই বস্তুনিষ্ঠ জগতের একটা অংশ। উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের শরীরও চেতনার সঙ্গে যুক্ত বা চেতনার পরিমণ্ডলের এক একটি কেন্দ্র এ

কথা আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। বাইরের এইসব চেতনার ক্ষেত্রের অস্তিত্ব এবং এক ধরনের বাস্তবতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু আমার সে চেতনায় প্রবেশের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অধিকার নেই। তাই আমি তাদের বস্তুনিষ্ঠ পদার্থ বা আমার চারপাশের 'বাস্তব জগতের' অঙ্গ হিসাবেই গণ্য করতে চাইব। পরন্তু, যেহেতু আমার সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তির বিভেদ নেই বরং তাদের উদ্দেশ্য এবং প্রবণতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, সুতরাং আমি নিজেও আমাকে ঘিরে থাকা সেই প্রকৃত বাস্তব জগতের একটা অংশ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি। আমি যেন আমার চেতন সত্তাকে (যে সত্তা মন উপজাত একটা রূপ দিয়ে এই জগৎটাকে গড়েছে) আবার সেইজগতেই ফিরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত সারিবদ্ধ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে প্রবাহিত যুক্তিসঙ্গত বিপর্যয়কারী উচ্ছৃঙ্খল ফলশ্রুতিসমূহের সম্মুখীন হলাম। এক এক করে সেগুলির আলোচনা করব। আমাদের নিজেদেরকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নেবার যে উচ্চমূল্যের বিনিময়ে জগতের একটা সন্তোষজনক চিত্র রচনা করা সম্ভব হয়েছে সে সম্বন্ধে অনবধানতার দরুন আপাত সর্বজনগ্রাহ্য, বহুল প্রচলিত যে দু'টি লক্ষণীয় বৈপরীত্য উদ্ভূত হয়েছে সে সম্বন্ধেই আপাতত আলোচনা করব।

এই বৈপরীত্যের প্রথমটি হল বিশ্বচিত্রকে 'বর্ণহীন, শীতল, শব্দহীন জেনে আমাদের বিস্ময়। বর্ণ ও শব্দ, তাপ ও শৈত্য আমাদের প্রাথমিক অনুভূতি ; যে জগতের গঠন থেকে আমাদের নিজেদের মানসিক সত্তাকে বিচ্যুত করেছি সেখানে এ সবের অভাব থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়।

দ্বিতীয় ব্যাপার হল জড়বস্তুর ওপর মনের এবং মনের ওপর জড়বস্তুর প্রভাবের ক্ষেত্র নির্ণয়ের আমাদের নিস্ফল প্রচেষ্টা—যে ব্যাপারটা চার্লস শেরিংটন (Charles Sherrington) প্রণীত 'Man on his Nature' গ্রন্থে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুসন্ধানের চমৎকার বিস্তৃত ব্যাখ্যার বর্ণনা থেকে আমরা ভালভাবেই জানি। নিজস্ব সত্তা বা মনকে বস্তুজগতের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাবার ত্যাগ স্বীকার করেই বস্তুজগতের গঠন প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে ; মন তার কোনো অংশ নয়, সুতরাং স্পষ্টতই বস্তুজগতের ওপর মন কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। অথবা মনের ওপরও বস্তুজগতের কোনো অংশ কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। (এই কথাটা অতি সংক্ষেপে স্পষ্ট একটি বাক্যে স্পিনোজা ব্যক্ত করেছেন পৃঃ ৩২ দ্রষ্টব্য)।

আমার বক্তব্যের কোনো কোনো দিক আরও বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই। প্রথমে আমি সি. জি. ইয়ুং-এর (C. G. Jung) একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেব। এই প্রবন্ধ আমাকে বিশেষভাবে তৃপ্ত করেছে, কারণ তাঁর এই বক্তব্যে আমাদের মতামতকে বিশেষভাবে তিরস্কার করা সত্ত্বেও একটা ভিন্ন প্রসঙ্গে একই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি মোটামুটি সন্তোষজনক বস্তুনিষ্ঠ জগৎচিত্র পাবার খাতিরে বোধশক্তির আধারকে বাস্তব জগৎচিত্র থেকে সরিয়ে রাখাকে আপাতত একটা বিরাট ত্যাগ স্বীকার বলে মনে করি, কিন্তু ইয়ুং আরও অনিক্রমণীয় দুরূহ পরিস্থিতি বিচার করে আরও অগ্রসর হয়েছেন এবং এই মূল্য দেবার জন্য আমাদের দোষারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন :

> সব বিজ্ঞান (Wissenschaft)-ই আত্মার ক্রিয়ানির্ভর, সেখানেই সব জ্ঞানের মূল নিহিত। বিশ্বজগতের সমস্ত বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্যে আত্মা মহত্তম। পৃথিবী বস্তুটির অস্তিত্বের পক্ষে একটা অপরিহার্য শর্ত (conditio sine qua non)। পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাবিদরা (কয়েকজন বিরল বিকল্প বাদ দিলে) এই সত্যের মর্ম এত কম উপলব্ধি করেছেন এটা খুবই আশ্চর্যের কথা। বহির্জগতের অজস্র জ্ঞাতব্য বস্তু, সব জ্ঞানের ধারককেই অন্তরালে নির্বাসন দিয়ে প্রায় অনস্তিত্বের অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন।[1]

ইয়ুং-এর কথা অবশ্যই সত্যি। এ কথাও স্পষ্ট, তিনি মনোবিজ্ঞানী হবার ফলে পদার্থবিদ বা শারীরতত্ত্ববিদের চেয়ে প্রাথমিক চালের পদক্ষেপের ত্যাগস্বীকার সম্বন্ধে অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ। তবুও আমি বলব, ২০০০ বছর ধরে যে চিন্তাধারা চলে আসছে তার থেকে তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ সরে আসাটা বিপজ্জনক। শুধু একটা বিশেষ, যদিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করা ছাড়া আমরা হয়ত এর ফলে সব কিছুই হারাব। কিন্তু সমস্যাটা এইখানে নিহিত : অপেক্ষাকৃত নতুন বিষয় মনোবিজ্ঞান একটা বাঁচার স্থান একান্তভাবে দাবি করছে। প্রাথমিক চালের পদক্ষেপ সম্বন্ধে চিন্তা করার অপরিহার্যতার প্রশ্ন মনোবিজ্ঞান আবার তুলে ধরেছে। এটা একটা শক্ত কাজ। আমরা এখনই এখানে এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করব না। এ প্রশ্ন উল্লেখ করেই সন্তুষ্ট থাকব।

---

1. Eranos Jarbuch (1946), p. 398

আমরা কেমন দেখলাম মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং আমাদের জগৎচিত্র থেকে মনকে বাদ দেওয়া, বা তাঁর ভাষায় সত্তাকে উপেক্ষা করার অভিযোগ তুলেছেন, আমি তেমনি তাঁর বিপরীত পক্ষের নজির কিম্বা সম্পূরক হিসাবে প্রাচীন ও আরও বিনয়ী বিষয় পদার্থবিদ্যা ও শারীরবিদ্যার কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের উক্তি উল্লেখ করে দেখাতে চাই 'বিজ্ঞানের জগৎ' কত ভয়ঙ্করভাবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে, যাতে মন এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির কোনো স্থান থাকছে না।

কিছু সংখ্যক পাঠকের এ. এস. এডিংটন-এর (A. S. Eddington) লেখা 'দুটি লেখার ডেস্ক'-এর কথা হয়ত মনে আছে। একটি তাঁর পুরনো পরিচিত ডেস্ক অন্যটি বৈজ্ঞানিক ভৌতবস্তু যা সবরকম অনুভূতি বিযুক্ত শুধু নয়, অনেক রন্ধ্রে ভরা। তার বেশির ভাগ অংশই শূন্যস্থান। শুধুমাত্রই শূন্যতা। সেই শূন্যতার মাঝে মাঝে শুধু কিছু অতিক্ষুদ্র কণা, ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস। তারা পরস্পরের মধ্যে নিজ আয়তনের অন্তত ১০,০০০ গুণ দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরছে। এই দুই বিপরীত ছবিকে তাঁর অসাধারণ সংনমনীয় প্রকাশভঙ্গীতে সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছেন ঃ

> পদার্থবিদ্যার জগতে আমরা আমাদের পরিচিত জীবনের একটা ছায়া-চিত্রানুষ্ঠান দেখতে পাই। আমার কনুইয়ের ছায়া আমার টেবিলের ছায়ার ওপর রাখা আছে···কালি ছায়া ছায়ার কাগজের ওপর প্রবাহিত হচ্ছে······ পদার্থবিদ্যা যে একটা ছায়ার জগৎ এই ব্যাপারটার স্পষ্ট নিশ্চিত উপলব্ধি বর্তমান জ্ঞানের উন্নতির একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[1]

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য করে দেখবেন, অতি সাম্প্রতিক অগ্রগতির এই দৃষ্টান্ত কিন্তু পদার্থবিদ্যার জগতে ছায়ার চরিত্র অর্জনে নিহিত নয়; আবডেরার ডিমক্রিটাস-এর (Democritus of Abdera) কাল থেকে অথবা আরও আগে থেকেই এই ব্যাপারটা জানা ছিল, কিন্তু তা আমাদের অগোচর ছিল। আমরা ভাবতাম জগৎটার নিজস্ব চরিত্র সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি। আমার যতদূর জানা আছে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞানের ধারণাভিত্তিক চিত্র বা প্রতিরূপ ইত্যাদি উদিত হয়েছে, তার আগে নয়।

---

1. The Nature of the Physical World [Cambridge University Press, 1920], Introduction.

অনতিবিলম্বে স্যার চার্লস শেরিংটন তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Man on his Nature' প্রকাশ করেন। এই বইটি মন ও জড়বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণের সৎ অনুসন্ধানে পরিপূর্ণ। আমি 'সৎ' কথাটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ (প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে) যে ব্যাপারের অস্তিত্ব নেই বলে আগে থেকেই জানা আছে, যা পাওয়া যাবে না এমন একটা গভীর প্রত্যয় দৃঢ়মূল, সেইরকম একটা বিষয়ে অনুসন্ধানে রত হতে গেলে অত্যন্ত গভীর আন্তরিক নিষ্ঠা প্রয়োজন। এই অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে ৩৫৭ পৃষ্ঠায় ঃ

> সুতরাং স্থানে ব্যাপ্ত আমাদের এই জগতে যা কিছু প্রত্যক্ষ গোচরীভূত করা সম্ভব, সেখানে মন ভূতের চেয়েও অদ্ভুত। অদৃশ্য, অধরা এমন কি যার কোনো আকারও নেই, একটা 'বস্তু'ই নয়। কোনো অনুভূতি দ্বারা স্বীকৃত নয়। কখনও তা হবে না।

আমি নিজের ভাষায় এ কথা এইভাবে প্রকাশ করতাম : মন প্রকৃতিবিজ্ঞানীর বস্তুনিষ্ঠ বাইরের জগৎকে নিজেরই উপাদানে গড়ে তুলেছে। যদি তার নিজের সৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার সরলীকরণের ব্যবস্থা নিতে না পারত মন তাহলে এই বিরাট কাজটা করতেই পারত না। তাই সেই সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে অঙ্গীভূত করে না।

আমি শেরিংটনের অবিস্মরণীয় গ্রন্থটির ঐশ্বর্য শুধু কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পারব না। পাঠকের নিজেকেই সমগ্র বইটি পড়তে হবে। তবু আমি কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তির আবার উল্লেখ করব :

> মন নিজে পিয়ানো বাজাতে পারে না, হাতের একটা আঙুলও নিজে নাড়াতে পারে না, পদার্থবিজ্ঞান……আমাদের সামনে এই অসমাধেয় সমস্যা উপস্থিত করে (পৃ. ২২২)।
>
> তারপর সেই বদ্ধ অর্গলের কাছে আমরা পৌঁছই ; চিন্তার সেই শূন্যস্থান—মন বস্তুকে 'কেমন করে' প্রভাবিত করে সেই প্রশ্ন। কোনো পরিণতির অভাব আমাদের বিহ্বল করে। এটা কি একটা ভুল বোঝার ফলাফল ? (পৃ. ২৩২)

বিংশ শতাব্দীর একজন শারীরবিদের পরীক্ষামূলক গবেষণার এই সিদ্ধান্তের পাশে সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক স্পিনোজার একটা সরল বক্তব্য রাখা যাক : B. Spinoza (Ethics Part III Prop 2) :

Nec corpus mentem ad cogitandum nec mens corpus ad notum neque ad quietem nec ad atiquid (si quid est) aliud determinarc potest.

[শরীর মনকে চিন্তা করাতে পারে না, মনও শরীরকে নাড়াতে থামাতে বা আর কিছু করাতে পারে না (যদি আর তেমন কিছু থাকে)]।

বদ্ধ অর্গল বদ্ধই রইল। আমরা কি তবে আমাদের কর্মের কর্তা নই? তবু আমরা আমাদের কাজ সম্বন্ধে দায়িত্ব অনুভব করি, ক্ষেত্র অনুসারে প্রশংসা বা শাস্তি পাই। এটা একটা ভয়ঙ্কর বৈপরীত্য। আমার মনে হয় যে, বিজ্ঞান অবহিত না হয়ে এখনও 'বর্জন নীতি' কবলিত অবস্থায় রয়েছে, যে জন্য এই বৈপরীত্য, সেই বিজ্ঞানের স্তরে এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না। এ কথা হৃদয়ঙ্গম করার মূল্য আছে, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। 'বর্জন নীতি'কে পার্লামেন্টের একটা আইন করে দূর করা যায় না। বৈজ্ঞানিক মনোভাব নতুন করে গড়তে হবে—বিজ্ঞান নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। সেজন্য অনেক সাবধানতা প্রয়োজন।

আমরা নিম্নলিখিত চমকপ্রদ অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি: আমাদের জগৎচিত্র গঠিত হল যে উপাদানে তা সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনের অঙ্গ—জ্ঞানেন্দ্রিয়জাত। সুতরাং সব মানুষেরই জগৎচিত্র সব সময়েই তাদের মনেরই নির্মিতি, তার অন্য কোনোরকম অস্তিত্বের প্রমাণ করা যায় না। অথচ মন তার নিজের গড়া জগতের বাইরে রইল। সে জগতে তার কোনো স্থান নেই। সেই জগতের কোনোখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা সাধারণতঃ এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করি না। কারণ আমরা সম্পূর্ণরূপে মেনেই রেখেছি যে, মানুষের বা জন্তুজানোয়ারদেরও ব্যক্তিত্ব তার শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেখানে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না এ খবর এতই আশ্চর্যজনক যে, এ বিষয়ে দ্বিধার উদ্রেক হয়—আমরা এ কথা স্বীকার করতে বিরত হই। মানুষের চেতনা মানুষের মাথার ভেতর আছে ভাবতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। হয়ত বা দুই চোখের মাঝের স্থান থেকে দু'এক ইঞ্চি পিছনে। সেখান থেকেই সেই ব্যক্তিত্ব আমাদের সহানুভূতি বোধ, ভালবাসা বা করুণাযুক্ত, সন্দিহান বা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দান করে। আমি জানি না কেউ লক্ষ্য করেছেন কিনা, সরল চিন্তায় আমরা আমাদের অনুভূতির নানা অঙ্গের মধ্যে কেবল চোখকেই

শুধুমাত্র গ্রাহকযন্ত্র মনে করি না। আলোকরশ্মি বাইরে থেকে চোখে আঘাত করছে এই প্রকৃত ঘটনাকে আমরা উল্টোভাবে দেখে ভাবতে চাই দৃষ্টি চোখ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে। কখনও কখনও ছবিতে সাজানো গল্পে এমন কি রেখাচিত্রের সাহায্যে আলোর বৈজ্ঞানিক সূত্র বা যন্ত্রপাতির বিবরণ সম্বলিত পুরানো বইতেও দেখা যায় আলোর রেখা চোখ থেকে বেরিয়ে একটা বস্তুর দিকে যাচ্ছে। যাবার পথটা একটা তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে, সেই তীরের মুখ বস্তুর দিকে। কোনো শিশুকে একটা নতুন খেলনা দিলে সে যেমন উজ্জ্বল আনন্দের দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকায় নিশ্চয়ই পাঠকদের, বিশেষত পাঠিকাদের তা স্মরণে আসে। তারপর পদার্থবিদ আপনাকে বলবেন প্রকৃতপক্ষে চোখ দুটি থেকে কিছুই নির্গত হয় না। বস্তুনিষ্ঠ নিরীক্ষণের নিরিখে শুধু ক্রমাগত আলোর শক্তিকণার আঘাত পেয়ে শক্তিকণা গ্রহণ করাই চোখের একমাত্র কাজ। এই কি বাস্তব! অবিশ্বাস্য বাস্তব! এর মধ্যে কিছু ফাঁক থেকে যাচ্ছে মনে হয়।

ব্যক্তিত্ব, সচেতন মন ইত্যাদির শরীরের অভ্যন্তরে কোনো অবস্থান আছে একথা শুধু প্রতীকী, শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনের সুবিধার্থে ভাবা হয় এই সত্য আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। আমাদের শরীর সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান জড়ো করে শরীরের অভ্যন্তরে একটা দরদী অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। আমরা সেখানে একটা পরম বিস্ময়কর ব্যস্ততা, অথবা বলা যেতে পারে যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ দেখতে পাব। আমরা লক্ষ লক্ষ বিশেষভাবে রচিত কোষ দেখতে পাব। সেগুলির বিন্যাস বৈচিত্র্যের জটিলতা সমীক্ষার আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে, তার দ্বারা বহুদূর বিস্তৃত পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন এবং সহযোগিতা সুশৃঙ্খলভাবে চলেছে; একটা নিয়মিত তালে তালে বিদ্যুৎরাসায়নিক স্পন্দন চলেছে যার অবিরাম দ্রুত সংস্থানিক পরিবর্তন ঘটছে, স্নায়ুকোষ থেকে কোষান্তরে সঞ্চারিত হচ্ছে, এক সেকেণ্ডের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশের হাজার হাজার যোগাযোগ খুলছে বন্ধ হচ্ছে; রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে এবং হয়ত আরও অনেক আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ঘটনা ঘটে চলেছে। এইসব আমরা দেখতে পাই, আর আমরা বিশ্বাস করতে পারি শারীরবিদ্যার জ্ঞান যতই অগ্রসর হবে, আমরা এ বিষয়ে আরও বেশি জানতে পারব। কিন্তু ভাবা যাক একটা বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত লক্ষ্য করা যাবে মস্তিষ্ক থেকে অনেক বহির্মুখী (efferent) সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুচ্ছের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ

কোষিক প্রসারণের (গতিসঞ্চারক স্নায়ুগুচ্ছের) মাধ্যমে বিদ্যুৎ স্পন্দন প্রবাহিত হয়ে একটি হাতের কয়েকটি পেশীতে পৌঁছল। ফলস্বরূপ শঙ্কিত কম্পিতভাবে একটা হৃদয়বিদারক বিচ্ছেদের সূচনার ইঙ্গিত করে হাতটি আপনাকে বিদায় জানাতে উদ্যত হল ; একই সময়ে আপনি হয়ত দেখলেন আর একগুচ্ছ স্পন্দনশীল তন্ত্রী কিছু গ্রন্থিতে ক্ষরণ সৃষ্টি করে আপনার আর্ত দুঃখিত চোখকে অশ্রুপূর্ণ করে তুলল। কিন্তু শারীরবিদ্যা যতই অগ্রসর হোক না কেন, আপনি নিশ্চিত জানেন এই পথের কোনো জায়গায়—চোখ থেকে কেন্দ্রস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, হাতের পেশীতে বা অশ্রুগ্রন্থিতে, কোনো জায়গাতেই আপনি ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব, তার তীব্র বেদনা, অন্তঃকরণের ব্যাকুল উদ্বিগ্নতা খুঁজে পাবেন না ; অথচ তার বাস্তবতা আপনার কাছে নিশ্চিত-ভাবে উপস্থিত, যেন আপনি নিজেই সেই যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, বস্তুত সত্যিই আপনি তা ভোগ করেছেন। শারীরবিদ্যা যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে আমার পরম বন্ধুর ক্ষেত্রেও এই যে ছবি আমাদের কাছে তুলে ধরছে, সে ছবি আমাকে এডগার অ্যালেন পো-এর (Edgar Alen Poe) এক বিখ্যাত গল্প মনে করিয়ে দেয়। সে গল্পটা হয়ত বহু পাঠকেরই মনে আছে। আমি **দি মাস্ক অফ দি রেড ডেথ**-এর (The Masque of the Red Death) কথা বলছি। দেশে ছড়িয়ে পড়া এক লাল মৃত্যুর মহামারীর বিভীষিকা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কোনো একটি ছোট রাজ্যের রাজা তাঁর অনুচরবৃন্দ নিয়ে দূরবর্তী এক বিচ্ছিন্ন প্রাসাদে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এক সপ্তাহ পর সেখানে এক বিরাট নাচ ও পান ভোজনের আয়োজন করলেন। সকলে তাতে নানা বিচিত্র পোশাক ও মুখোস পরে যোগদান করলেন। একটা লম্বা মুখোস একটা ওড়নায় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ছিল। পোশাকটিও ছিল সম্পূর্ণ লাল রঙের, যেটা সকলেরই সেই মহামারীর প্রতীক বলে মনে হয়েছিল। তাতে সকলে ভয়ে কম্পিত হচ্ছিলেন। এমন অদ্ভুত সাজ নির্বাচন তাঁদের সন্দেহাকুল করে তুলল। তাঁরা ভাবলেন হয়ত বাইরের কেউ এসে ঢুকেছে তাঁদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত একজন সাহসী যুবক সেই লাল মুখোসের কাছে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ তার মুখাবরণ আর মাথার খোলস ছিঁড়ে ফেললেন। দেখা গেল ভেতরে কিছুই নেই।

আমাদের মাথার খুলির ভেতরটা অবশ্য শূন্য নয়। ভেতরে যা আছে তা যতই বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক হোক না কেন তা আমাদের প্রাণশক্তি, আত্মার আবেগ ও অনুভূতির তুলনায় আসলে কিছুই নয়।

এ কথাটা উপলব্ধি করলে প্রথমে হয়ত মানুষের মন বিচলিত হয়ে ওঠে। আরও গভীরভাবে চিন্তা করে কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে আশ্বাস যোগায়। যদি আপনার এক অতি প্রিয় বন্ধুর মৃতদেহের সামনে দাঁড়াতে হয় যার বিচ্ছেদে আপনি গভীর শোক অনুভব করছেন তবে তার শরীর যে কোনো দিনই তার ব্যক্তিসত্তার কেন্দ্র ছিল না, শুধু ব্যবহারিক সুবিধার জন্য একটা প্রতীক রূপে ধরা ছিল এমন চিন্তা কি আপনার শোক প্রশমিত করবে না?

পদার্থবিজ্ঞানে অত্যন্ত আগ্রহী ব্যক্তিরা হয়ত এইসব প্রসঙ্গের সংযোজন হিসাবে আমার কাছ থেকে ব্যক্তি ও বস্তু (subject and object) সম্বন্ধে কিছু কথা শুনতে আশা করবেন, যে বিষয়টি কোয়াণ্টামতত্ত্বের চিন্তাধারার সূত্রে এখন বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। নিলস বোর (Niels Bohr), ভের্ণের হাইজেনবার্গ (Werner Heisenberg) ও ম্যাক্স বর্ণ (Max Born) ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা যে বিষয়ের প্রবক্তা। প্রথমে তাঁদের চিন্তাধারার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক।*

আমরা কোনো প্রাকৃতিক বস্তু (বা পদার্থ সমাবেশ)-এর সঙ্গে 'সংস্পর্শে না আসা' পর্যন্ত তার সম্বন্ধে কোনো সত্য বর্ণনা দিতে পারব না। এই 'সংস্পর্শ' একটি বাস্তব পারস্পরিক ভৌত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সেটা যদি বস্তুটিকে শুধু চোখে দেখার মাধ্যমেই হয় তবে বস্তুটির ওপর আলো দিয়ে আঘাত করতে হবে, যে আলো বস্তুটি থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখে অথবা অনুরূপ কোনো গ্রাহক যন্ত্রে এসে পড়বে। তার মানে বস্তুটি আমাদের দেখার পদ্ধতিতে প্রভাবিত হচ্ছে। যদি বস্তুটিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা হয় তবে তার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই পাওয়া যাবে না। তবে এই প্রভাব অপ্রাসঙ্গিকও নয় অথচ সম্পূর্ণ নিরীক্ষণযোগ্যও নয় এই বক্তব্যের ওপরই তত্ত্বটিতে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বহু সংখ্যক সযত্ন পর্যবেক্ষণের পরও বস্তুটি এমন অবস্থায় পৌঁছবে, যে অবস্থার কিছু দিকের খবর (শেষ 'পর্যবেক্ষণ' করা) জানা থাকবে আর কিছু (শেষ পর্যবেক্ষণের প্রভাবে যেগুলিতে পরিবর্তন ঘটেছে) অজানা থাকবে, বা সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে জানা যাবে না। একটা ভৌত বস্তুর সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন বিবরণ কেন পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে উপরোক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে।

---

* আমার লিখিত পুস্তক Science and Humanism [Cambridge University Press, 1951, p. 49]

এ কথা যদি মানতে হয়—সম্ভবত মানতে হবেই, তবে তা প্রকৃতির বোধগম্যতার সূত্রকে অগ্রাহ্য করছে। কিন্তু ব্যাপারটা বিশেষ নিন্দনীয় নয়। আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে, প্রাথমিক দু'টি সূত্র বিজ্ঞান মানতে বাধ্য নয়, আমরা এ দু'টি সূত্র পদার্থবিজ্ঞানে শুধুমাত্র অনেক শতাব্দী ধরে মেনে চলছিলাম এবং তা সহজে পরিবর্তন করা যায় না। আমাদের বর্তমান জ্ঞান এখন ওই দুই সূত্রের পরিবর্তন দাবি করছে এ কথাটা মানা সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত নই। আমার মনে হয় আমাদের প্রতিরূপগুলি এমন ভাবে একটু পরিবর্তন করে নেওয়া যায় যাতে কোনো মুহূর্তেই এমন সব 'ধর্ম' উপস্থিত হবে না যে ধর্মগুলি তত্ত্বগতভাবে যুগপৎ দেখা সম্ভব নয়। এমন প্রতিরূপ যা যুগপৎ দেখার দিক থেকে দুর্বলতর কিন্তু পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনে দক্ষতর। যাই হোক, এ সব পদার্থবিদ্যার ভেতরের কথা এবং এখানে এখনই সিদ্ধান্ত স্থির করার ব্যাপার নয়। কিন্তু তত্ত্বটির যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে দেওয়া হল, যাতে মাপবার যন্ত্র এবং যে বস্তুর পর্যবেক্ষণ চলছে, তার মধ্যে একটা অনিবার্য এবং অনিরীক্ষণীয় প্রভাব ঘটছে বলে বোঝা গেল, তা বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞানতত্ত্বগত একটা বিরাট ফলশ্রুতিকে পুরোভাগে নিয়ে এসেছে। পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে একটা রহস্যজনক সীমানার দিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এই সীমারেখাটা খুব স্পষ্ট নয় বলে বলা হয়ে থাকে। আমরা বুঝতে পারছি, আমরা একটা বস্তুকে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টির পদ্ধতি দ্বারা রূপান্তরিত বা রঞ্জিত না করে কখনও পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। আমরা বুঝতে পারছি যে, আমাদের সূক্ষ্ম দেখার পদ্ধতি এবং আমাদের পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তাধারায় ব্যক্তি ও বস্তুর রহস্যজনক সীমারেখার বেড়া ভেঙে গেছে।

ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে যে কালোত্তীর্ণ ভেদাভেদ কল্পনা করা হয়েছে, বহু চিন্তাবিদ অতীতে ও বর্তমানে যা মেনেছেন ও মানছেন তার সত্যতা আমি প্রথমতঃ মেনে নিয়ে এই মতামতের সমালোচনা করতে উদ্যত হব। আবডেরার ডিমক্রিটাস থেকে Old Man of Konigsberg পর্যন্ত যে সব দার্শনিকরা এই মতামত মেনেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই নেই যিনি আমাদের সব অনুভূতি, উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণের প্রচুর ব্যক্তিগতভাব যুক্ত বলে কান্টের ভাষায় 'বস্তুর নিজস্বতা'র খবর দেয় না, এই বক্তব্যের ওপর জোর দেন নি। এই সব চিন্তাবিদদের ভিতরে কারো কারো মনে

এ সম্বন্ধে হয়ত বা কিছুটা জোরালো কিম্বা সামান্য বিরূপতা ছিল, কিন্তু কাণ্ট তাঁর 'বস্তুর নিজস্বতা' সম্বন্ধে কখনও কোনো কিছুই জানা যাবে না এই নিশ্চিত বক্তব্য দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় ফেলে দিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সব দৃষ্ট বস্তুতে ব্যক্তিগত চেতনার ধারণা একটা অত্যন্ত প্রাচীন ও পরিচিত চিন্তা। বর্তমান অবস্থায় নতুন ব্যাপারটা দাঁড়ালো এইরকম ঃ আমরা যে প্রধানত আমাদের অনুভূতি বোধের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেই পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা করি শুধু তাই নয়, বরং বিপরীতভাবে—যে পরিবেশকে জানতে চাইছি সেটাই আমাদের দ্বারা, বিশেষ করে নিরীক্ষণ করার যে সব ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

হয়ত এই ব্যাপারটাই ঘটছে—কিছুদূর পর্যন্ত এটা নিশ্চিতভাবেই সত্য। হয়ত নতুন আবিষ্কৃত কোয়াণ্টাম পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এই প্রভাবিতকরণের পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমার নিচে নামানো যাবে না। তবুও আমি এ ব্যাপারটাকে বস্তুর ওপর দ্রষ্টা বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে ভাবতে পারছি না। কারণ ব্যক্তি এমন বস্তু যা অনুভব করে, চিন্তা করে। 'শক্তির জগৎ'-এ অনুভূতি এবং চিন্তার অস্তিত্ব নেই ; তারা শক্তির জগতে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না, এ তথ্য আমরা স্পিনোজা এবং স্যার চার্লস শেরিংটনের বক্তব্য থেকে জেনেছি।

আমরা ব্যক্তি এবং বস্তুর পার্থক্য সম্পর্কে কালোত্তীর্ণ মতবাদ মেনে নিয়েছি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্ত কথা বলা হয়েছিল। যদিও আমাদের এ ধারণা 'প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারিক কারণে' গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু দার্শনিক চিন্তাতে এ ধারণা বর্জন করা উচিত বলে আমার বিশ্বাস। এর অনড় যুক্তিগত ফলশ্রুতি সম্বন্ধে কাণ্ট-এর উপলব্ধি হল, ঊর্ধ্বভাবলোকের কিন্তু শূন্যগর্ভ কল্পনার ভিত্তিতে যে 'বস্তুর নিজস্ব অস্তিত্ব'র ধারণা গড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে আমরা চিরকালই কিছুই জানি না।

আমার মন এবং বহির্জগৎ একই মৌলিক উপাদানে গঠিত। সব মন এবং তার বহির্জগতের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। যদিও মন এবং বহির্জগতের মধ্যে অগণিত বাহুল্যের পারস্পরিক যোগসূত্র বিদ্যমান। জগৎ শুধু একবারই আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে। একটি অনুভূত জগৎ একটি বিরাজমান জগৎ এরকম কিছুই নেই। ব্যক্তি ও বস্তু একই। তাদের মাঝের ব্যবধানের প্রাচীর পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কারণে ভেঙে গেছে তা নয়, কারণ হল, আসলে এই প্রাচীরটাই নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গাণিতিক স্ববিরোধ

মনের একত্ব

আমাদের অনুভূতিশীল, প্রত্যক্ষদর্শী ও চিন্তাশীল আত্মবোধকে আমাদের বৈজ্ঞানিক জগৎচিত্রের কোনো স্থানেই কেন সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না তার উত্তর নিম্নলিখিত এই কথাগুলিতে প্রকাশ করা যায়ঃ কারণ এই আত্মবোধ নিজেই সেই জগৎচিত্র। এই আত্মবোধ জগৎচিত্রের সঙ্গে অভিন্ন, সুতরাং পূর্ণ একে অংশরূপে ধারণ করতে পারে না। কিন্তু আমরা এখানে একটা গাণিতিক স্ববিরোধের সম্মুখীন হচ্ছি ; অজস্র সচেতন আত্মবোধের অস্তিত্ব আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, অথচ জগৎ মাত্র একটি। জগৎ সম্বন্ধে ধারণা যে প্রক্রিয়াতে গড়ে উঠেছে সেই পদ্ধতির জন্যই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন সচেতন সত্তার নিজস্ব গণ্ডীগুলি তাদের 'ব্যক্তিগত' সীমা অতিক্রম করে স্থানে স্থানে আংশিকভাবে পরস্পরের গণ্ডীতে ঢুকে পড়ে। সকলের পক্ষে সাধারণ এলাকার অংশটাই 'আমাদের চারপাশের বাস্তব জগৎ' গড়ে তোলে। তা সত্ত্বেও একটা অস্বস্তিবোধ থেকেই যায়, যা মনে প্রশ্ন তোলেঃ তোমার আর আমার জগৎ কি প্রকৃতপক্ষে এক ? শুধু একটাই কি সত্য জগৎ আছে যার চিত্র আমাদের প্রত্যেকের উপলব্ধ জগৎচিত্র থেকে বিশ্লিষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে ? এবং যদি তাই হয়, তবে এই সব চিত্রগুলি কি সত্য জগতের অনুরূপ, না সত্য জগতের 'নিজস্ব' রূপটা আমরা যা দেখছি তার চেয়ে অন্যরকম ?

এই প্রশ্নগুলি সুদক্ষভাবে উদ্ভাবিত, কিন্তু আমার মতে প্রধান লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করে। এগুলির কোনো যথার্থ উত্তর নেই। এই প্রশ্নগুলি যে বৈপরীত্য উদ্ভূত বা যে বৈপরীত্যের দিকে নিয়ে যায়, তার উৎসকেই আমি গাণিতিক স্ববিরোধ বলছিঃ বহু চেতনাময় সত্তার, মানসিক উপলব্ধি থেকে একটি জগৎ রচিত হচ্ছে। সংখ্যার এই স্ববিরোধের সমাধান থেকে এইসব প্রশ্ন দূর হয়ে যাবে এবং আমি অবশ্যই বলতে পারি যে, প্রশ্নগুলির নেহাৎ ছদ্মরূপ ধরা পড়বে।

সংখ্যার এই স্ববিরোধ থেকে উদ্ধারের দু'টি পথ আছে, যে দু'টিই বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তার (যা প্রাচীন গ্রীক চিন্তাভিত্তিক এবং সম্পূর্ণভাবে 'পাশ্চাত্য' চিন্তা) দৃষ্টিকোণ থেকে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হতে পারে। একটা পথ হল

লাইবনিট্জ্-এর (Leibniz) একক জীবসমষ্টি 'মোনাড'-এর (monads) ভয়াবহ মতবাদ অনুযায়ী জগৎ-এর বহুত্বের রূপ ; প্রত্যেকটি মোনাড নিজেই এক একটি নিজস্ব জগৎ ; তাদের ভিতরে কোনো যোগাযোগ নেই ; মোনাডের কোনো জানালা নেই ; তা যোগাযোগ বিনিময় সম্ভাবনাহীন ; তা সত্ত্বেও তারা যে পরস্পরের মধ্যে একমত হতে পারে তার কারণ হল 'পূর্বনির্ধারিত সঙ্গীত'র (preestablished harmony) অস্তিত্ব। আমার মনে হয় খুব কম লোকের কাছেই এই মতবাদের আবেদন থাকবে, বা তারা আদৌ এটা সংখ্যার স্ববিরোধের কোনো সমাধান বলে মনে করবেন।

সুতরাং স্পষ্টতই একটাই বিকল্প পথ থাকছে, তা হল মনের বা চেতনার একীভবন। তার বহুত্ব শুধু আপাতদৃষ্ট ; বস্তুত মন শুধু একটাই আছে। এটাই উপনিষদের মতবাদ। এবং শুধু উপনিষদেরই নয়। নানা আধ্যাত্মিক সাধকের ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের উপলব্ধির ফলশ্রুতিতে এইরকম ধারণা বার বার উপস্থিত হয়েছে, যখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সংস্কার দ্বারা তা প্রতিরোধ করা হয় নি ; অর্থাৎ পশ্চিম দেশে পূর্বদেশের মত এই মতবাদ সহজে স্বীকৃত হয় না। উপনিষদের বাইরে একজন তেরশো শতাব্দীর পারসী ইসলাম অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক আজিজ নাসাফীর (Aziz Nasafi) কথা উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করছি। এই উদ্ধৃতি আমি ফ্রিট্জ মেয়ার-এর (Fritz Meyer)[1] মূল জার্মান প্রবন্ধ থেকে অনুবাদ করছি ঃ

> কোনো জীবন্ত প্রাণীর মৃত্যুর পর তার আত্মা আত্মিক জগতে এবং দেহ দৈহিক জগতে ফিরে যায়। তার মধ্যে অবশ্য দেহই পরিবর্তিত হতে পারে। আত্মিক জগৎ একটি অনন্য আত্মা। সেই আত্মা যেন দৈহিক জগতের পিছনে একটা আলো রূপে স্থিত থাকে, এবং যখনই একটি জীব সৃষ্ট হয়, তার খোলা জানালা দিয়ে সেই আলো যেন বিকীর্ণ হয়। কতটা আলো এই জগতে প্রবেশ করবে তা সেই জানালার প্রকৃতি ও মাপের ওপর নির্ভর করে। আলো নিজে কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে।

দশ বছর আগে আলডুস হাক্সলে (Aldous Huxley) একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। পুস্তকটির নাম দিয়েছিলেন 'Perennial

1 Eronos Jahrbuch, 1946

Philosophy[2] বা চিরন্তন দর্শন। বইটি বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন যুগের অতীন্দ্রিয়বাদীদের রচনা সংগ্রহ। তার যেকোনো পাতা খুললেই একই ধরনের অতি সুন্দর উক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন দেশের মানুষ—যারা বহু শতাব্দীর ব্যবধানে এবং আমাদের পৃথিবীতে যত দূরত্ব সম্ভব তার দ্বারা বিচ্ছিন্ন থেকে, পরস্পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত না হয়েও কি আশ্চর্যভাবে একই রকম কথা বলেছেন দেখে অবাক হতে হয়।

তবু একথা ঠিক যে পশ্চিমী চিন্তাধারায় এই মতবাদের আবেদন খুবই কম, এ চিন্তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না এবং বলা হয় এসব অলীক, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা। ব্যাপারটা এইরকম, কারণ আমাদের বিজ্ঞান—অর্থাৎ গ্রীক বিজ্ঞান বস্তু-নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জ্ঞান-এর কর্তা বা মনকে সম্যকভাবে বোঝা থেকে বিযুক্ত থেকেছে। আমি বিশ্বাস করি ঠিক এই জায়গাতেই আমাদের বর্ত্তমান চিন্তাধারার কিছু সংশোধন প্রয়োজন ; হয়ত প্রাচ্য চিন্তাধারার কিছু রক্ত এদিকে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। এ কাজ সহজ নয়। অতি যত্নে, অনেক দুর্বিপাক বাঁচিয়ে আমাদের এ কাজ করতে হবে। রক্তদান প্রক্রিয়াতে সব সময়েই জমাট বেঁধে যাবার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। আমাদের বিজ্ঞান চিন্তা যে অপূর্ব সূক্ষ্ম যুক্তিযুক্ত যথাযথ নির্দেশনার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে, কোনোখানে কোনো যুগে যার তুলনা মেলে না, তা আমরা হারাতে চাই না।

তা সত্ত্বেও, লাইবনিট্‌জ্‌-এর ভয়াবহ মোনাডতত্ত্বের বিপক্ষে অতীন্দ্রিয়বাদী শিক্ষায় প্রচারিত সর্বমনের পরস্পরের একত্ব এবং তার সঙ্গে সর্বোচ্চ মনের একত্বর স্বপক্ষে হয়ত একটা দাবি করা যায়। পরীক্ষামূলক সত্য থেকে একত্ববাদের ধারণার একটা সমর্থন পাওয়া যায় ; কারণ চেতনার বহুত্ব কখনও মনের অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। চেতনা সর্বদা একক। আমাদের কারো কখনও একাধিক চেতনার অভিজ্ঞতা হয়নি শুধু তাই নয়, জগতের কোনোখানে কখনও এমন ঘটার কোনো নজীর পাওয়া যায়নি। আমি যদি বলি একটি মনের একটির বেশি চেতনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তবে সেটা এক কথাই ঘুরিয়ে বলা হয়ে দাঁড়াবে। আমরা এর বিপরীত কিছু কল্পনাই করতে পারি না।

তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এবং পরিস্থিতিতে আমরা এই অকল্পনীয় ব্যাপার ঘটার বা প্রায় ঘটার আশা করি, যদি তা কখনও ঘটা সম্ভব হয়। এই কথাটা

2 Chatto and Windus, 1946.

আমি একটু বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই এবং তার আরও স্পষ্ট রূপ দিতে চাই চার্লস শেরিংটনের কিছু কথার উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি ছিলেন একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী এবং স্থিতধী বিজ্ঞানী (যেমন সচরাচর ঘটে না)। যতদূর আমার জানা আছে, উপনিষদের দর্শন সম্বন্ধে তাঁর কোনো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল না। আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল হয়ত ভবিষ্যতে একত্বের মতবাদকে আমাদের বৈজ্ঞানিক জগৎচিত্রের মধ্যে স্থান দেবার পথ এমনভাবে পরিষ্কার করা যাতে আমাদের যুক্তিবিচারের যথাযথ নির্দেশক্ষমতা ও সৌম্যতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়।

কিছু আগেই বলেছি যে, আমরা একটি মনে একাধিক চেতনার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না। আমরা এ কথাটা বলতে পারছি ঠিকই কিন্তু তা আমাদের চিন্তনীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ নয়। বিকারগ্রস্ত রোগীর 'দ্বৈত বিযুক্ত ব্যক্তিত্ব'র ক্ষেত্রেও দু'টি ব্যক্তিত্ব পর্যায়ক্রমে আসে যায়। তারা কখনও একযোগে একই স্থান অধিকার করে না। তারা পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, এটাই এই রোগের বৈশিষ্ট্য।

আমরা স্বপ্নের পুতুল নাচে বিভিন্ন ভূমিকার অভিনেতাদের নড়াচড়া কথা-বলা সূতো নেড়ে নিয়ন্ত্রণ করি কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। শুধু একজন তার মধ্যে 'আমি' হয়ে বিরাজ করে, যে স্বপ্ন দেখছে। তার মাধ্যমেই আমি অভিনয় করি এবং তাৎক্ষণিক কথা বলি। সেই সঙ্গে আর একজন কি উত্তর দেবে, সে আমার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার অনুরোধ মানবে কিনা সেই উদ্বেগে উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করি। আমি যে তাকে দিয়ে যা খুসী করাতে পারি সে চিন্তা আমার মাথায় আসে না। বস্তুত তা সত্যিও নয়। কারণ এইরকম স্বপ্নের ক্ষেত্রে 'অন্য ব্যক্তি'টি আসলে এমন একজন যে আমার জাগ্রত জীবনে কোনো বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে, এবং যার ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই তারই ভূমিকার অভিনেতা। এই আশ্চর্য ব্যাপারটাই পুরাকালে স্বপ্নসূত্রে জীবিত বা মৃত ব্যক্তির, ভগবান বা কোনো বীরনেতার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ঘটার দৃঢ়বিশ্বাসের কারণ। এটা এমন একটা কুসংস্কার যা সহজে দূর হয় না। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে এফিসাস-এর (Ephesus) হেরাক্লিটাস (Heraclitus) নিশ্চিত ভাবে এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য কিছু কিছু সংস্কারাচ্ছন্ন বক্তব্যে চিন্তার এমন পরিচ্ছন্নতা

পাওয়া যায় না। লুক্রেটিয়াস কেরাস (Lucretious Carus) যিনি নিজেকে একজন আলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানের প্রবক্তা বলে মনে করতেন, তিনিই এই কুসংস্কার খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত মেনে চলেছিলেন। আমাদের কালে এমন ধারণা হয়ত বিরল, কিন্তু সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

আর একটা অন্য ধরনের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। আমার নিজস্ব চেতন মন (যা আমি এক বা অদ্বিতীয় বলে মনে করি) কেমন করে আমার শরীর গঠনকারী কোষসমূহের (বা তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কোষসমষ্টির) সমন্বয়ে সৃষ্টি কিম্বা আমার জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাদের সমন্বয়ের যুক্ত ফলাফল হতে পারে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। আমরা প্রত্যেকে যে বিরাট 'কোষসমষ্টির সমবেত ঐশ্বর্যের' ধারক তার দ্বারা মনের পক্ষে বহুত্ব প্রকাশের সবচেয়ে বেশি সুযোগ ছিল, যদি মনের আদৌ তা করা সম্ভব হত। 'কোষসমষ্টির সমবেত ঐশ্বর্য' বা 'কোষের সংযুক্ত রাজ্য' এইসব কথাগুলি এখন আর উপমা বলে ভাবা হয় না। শেরিংটনের কথা শোনা যাক ঃ

> যে সব কোষ উপাদান আমাদের গড়ে তুলেছে তার প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণকেন্দ্র এমন একটা বক্তব্য শুধু একটা কথার কথা নয়, শুধু বিবরণ দেবার সুবিধার উদ্দেশ্যে বলা নয়, শরীরের উপাদানস্বরূপ যে কোনো কোষ শুধু একটা নির্দিষ্ট একক রূপে দেখা যায় শুধু তাই নয়, সেটি নিজস্ব কেন্দ্রীভূত একটি একক প্রাণ। সেটি তার নিজস্ব জীবন যাপন করে…কোষ হল একক প্রাণ, আর আমাদের প্রাণও তেমনি একক প্রাণ, যা সম্পূর্ণরূপে কোষজীবনগুলি দিয়ে তৈরি।[1]

কিন্তু এই উপাখ্যান আরও বিশদ আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। মস্তিষ্কের বিকারতত্ত্ব এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির শারীরবৃত্তিক পর্যবেক্ষণ দুই-ই নিশ্চিতভাবে অনুভূতির এলাকাগুলির আঞ্চলিক ব্যবধান সূচিত করে—তাদের বহুদূর বিস্তৃত নিজস্বতা এবং স্বাধীনতা আশ্চর্যজনক। কারণ তার ফলে আমরা আশা করতে পারি, মনের বিভিন্ন স্বাধীন এলাকা থাকবে; কিন্তু তা নেই। একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণ দেওয়া যায় ঃ যদি দূরের একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে প্রথমে ডান চোখ বুজে, পরে বাঁ চোখ বুজে এবং শেষে দু' চোখ খুলে দেখা

1 Man on his Nature, 1st edn. [1940], P. 73

যায় তবে কোনো বিশেষ লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যাবে না। দৃশ্যের মানসিক পটভূমি তিন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ একরকম। এর কারণ এমন হতে পারে যে, রেটিনার সঙ্গে যুক্ত এইসব বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রীগুলি বার্তা পাঠাচ্ছে একই কেন্দ্রে—যেখানে 'অবলোকন ক্রিয়াটি তৈরি হচ্ছে'—ঠিক যেমন আমার বাড়ির সদর দরজার সংলগ্ন সুইচের বোতাম এবং আমার স্ত্রীর শোবার ঘরের সুইচ, এই দুটিই রান্নাঘরের দরজার ঘণ্টাকে বাজাতে পারে। এই ব্যাখ্যা সবচেয়ে সহজ; কিন্তু এটা ভুল ব্যাখ্যা।

ঝলকে ঝলকে নিয়মিত তালে আলো জ্বলা ও নেভার কম্পনসীমা সংক্রান্ত একটা আকর্ষণীয় পরীক্ষা শেরিংটন বিবৃত করেছেন। আমি তার একটা খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। গবেষণাগারের ভিতরে একটা ছোট লাইট হাউস কল্পনা করা যাক। ধরা যাক সেখান থেকে ঝলকে ঝলকে আলো বেরোচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে 40, 60, 80 বা 100 বার। আলো জ্বলা-নেভার এই নিয়মিত স্পন্দনের দ্রুততা বাড়াতে বাড়াতে, পরীক্ষার খুঁটিনাটি অবস্থার ওপর নির্ভর করে স্পন্দনের মান একটা বিশেষ সীমায় পৌঁছলে দর্শকের কাছে আলো নিরবচ্ছিন্ন বলে মনে হবে।[1] ধরা যাক একটা বিশেষ ক্ষেত্রে স্পন্দন সীমার মান প্রতি সেকেণ্ডে 60 বার। এবার অন্যসব অবস্থা এক রেখে এমন ব্যবস্থা করা হল যাতে প্রতি দ্বিতীয় ঝলক ডান চোখে এবং অপর ঝলক বাঁ চোখে পৌঁছবে। সুতরাং প্রতিটি চোখ প্রতি সেকেণ্ডে 30 টা করে ঝলক দেখতে পাবে। যদি এই উত্তেজনা শরীরের একই কেন্দ্রে পরিবাহিত হয়, তবে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে কোনো তফাৎ বোঝা উচিত নয়। আমি যদি আমার সদর দরজার ঘণ্টার সুইচের বোতাম প্রতি দুই সেকেণ্ড অন্তর টিপে দিই এবং আমার স্ত্রী তার শোবার ঘরে আমার পরে একটা অন্তর অন্তর ঠিক তাই করেন তবে রান্নাঘরের দরজার ঘণ্টা প্রতি সেকেণ্ডেই বাজবে—যেন আমাদের কেউ একজন বা দুজনে এক সঙ্গে প্রতি সেকেণ্ডে বোতাম টিপছেন। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত আলোর ঝলকের দ্বিতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি। 30টা ঝলক ডান চোখে এবং 30 টা ঝলক বাঁ চোখে পৌঁছে আলোর বিচ্ছিন্ন স্পন্দনের অনুভূতি দূর করতে পারে নি। অর্থাৎ দু' চোখ খোলা অবস্থাতেও অবিচ্ছিন্ন আলোর অনুভূতি সৃষ্টি করতে স্পন্দনের দ্রুততার মান দু' গুণ হওয়া প্রয়োজন।

1 এইভাবেই চলচ্চিত্রের পরপর বিচ্ছিন্ন ছবিগুলি একটানা ভাবে মিলে যায়।

অর্থাৎ বাঁ ও ডান চোখের প্রত্যেকটির জন্যই সেকেণ্ডে 60টি স্পন্দনের প্রয়োজন হয়েছে। এই ব্যাপার থেকে পাওয়া প্রধান সিদ্ধান্ত শেরিংটনের ভাষায় বলা যাক :

> মস্তিষ্কের যন্ত্রপরিচালনার অঞ্চলগুলির মধ্যে স্থানগত যোগসূত্র এই দু'টি বিবরণকে যুক্ত করছে না···যেন ডান ও বাঁ চোখের প্রতিবিম্ব দু'টি দু'জন পৃথক দর্শক দেখছেন এবং তাঁদের দুজনের মন একটা মনে পরিণত হচ্ছে। যেন ডান চোখ এবং বাঁ চোখের দৃষ্টির নিজস্ব পৃথক অনুভূতি বিস্তৃত হয়ে মানসিকভাবে মিলিত হয়ে একীভূত হয়েছে···যেন প্রত্যেকটি চোখের তার স্বমর্যাদায় স্থিত একটা আলাদা অনুভূতির ব্যবস্থা আছে যাতে সেই চোখভিত্তিক মানসিক বৃত্তি সম্পূর্ণ দর্শনানুভূতি স্তর পর্যন্ত বিকশিত হয়ে ওঠে। শারীরবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীতে সেগুলি যেন দৃষ্টিবিষয়ক উপমস্তিষ্ক। ডান ও বাঁ চোখের জন্য তাহলে তেমন দু'টি উপমস্তিষ্ক থাকতে হয়। দেহবস্তুর গঠনগত সংযোগের জন্য নয়, ক্রিয়ার সমকালীনতাই তাদের মানসিক সহযোগিতা ঘটায় বলে মনে হয়।[1]

এরপর কয়েকটি ব্যাপক সাধারণ ধারণার আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ তুলে ধরছি :

> তবে কি বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন প্রায় স্বাধীন উপমস্তিষ্ক আছে? 'পাঁচটি' প্রাচীন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে উচ্চতর কলাকৌশলে উচ্চতম মস্তিষ্কে একীভূত না হয়ে সেখানে তাদের নিজস্ব আলাদা গণ্ডী বজায় রেখে বিযুক্ত থাকে। মন কতদূর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রায় স্বাধীন প্রত্যক্ষ অনুভূতিশীল মনসমূহের সমষ্টি, যে মনগুলি মানসিক প্রক্রিয়ায় প্রধানত সমকালীন অভিজ্ঞতাসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে অখণ্ডভাবে গ্রথিত হয়?···'মন'-এর ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্র কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বভূত প্রধান কোষে নিজেকে সংযুক্ত করে না। বরং লক্ষ লক্ষ ভাগে বিভক্ত গণতন্ত্রে নিজেকে বিস্তৃত করে, যার প্রত্যেকটি একক এক একটি কোষ। বিভিন্ন উপপ্রাণসমূহের সমষ্টিজাত সমগ্র বাস্তব-জীবন অখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও তার খণ্ড উপাদানগুলির সংযুক্তির রূপটি তার

1. Man on his Nature, pp. 273–5

ভেতর ফুটে ওঠে এবং তার পরিচালনায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণকেন্দ্রের একযোগে কর্মরত রূপটিও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করে…কিন্তু মন ব্যাপারটির ক্ষেত্রে এসব কিছুই নেই। একটি একক স্নায়ুকোষ কখনই একটি উপমস্তিষ্ক নয়। শরীরের কোষিক গঠন থেকে মন গঠনের কোনো আভাসই পাওয়া যায় না।…একটি একক প্রধান মস্তিষ্ককোষ মানসিক প্রতিক্রিয়াকে, উচ্চতম পর্যায়ের অসংখ্য কোষসমষ্টি নির্মিত পাত-এর চেয়ে বেশি একীভূত অবিচ্ছিন্ন চরিত্র দিতে পারে না। জড়পদার্থ এবং শক্তির গঠন কণাময়, 'প্রাণ'-এর চরিত্রও সেইরকম, কিন্তু মনের তা নয়।

যে সব উক্তি আমার মনকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে আমি শুধু সেখান থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। প্রাণিদেহের মধ্যে কি ঘটছে সে বিষয়ে শেরিংটনের অতি উচ্চমানের জ্ঞান দ্বারা তথ্যসমূহের যে বৈপরীত্যের প্রতিকূলতার মুখোমুখি সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁর অকপট খোলামনের বুদ্ধিপ্রয়োগের বিশ্বস্ততায় তিনি তা গোপন করতেও চেষ্টা করেন নি, সহজ ব্যাখ্যায় সরিয়ে দিতেও চেষ্টা করেন নি (যা অনেকেই করতেন বা করেছেন), বরং কঠোরভাবে তা উন্মুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। কারণ তিনি জানতেন, এইভাবেই বিজ্ঞান ও দর্শনের সমাধানের কাছে পৌঁছান যায়, আর 'সুন্দর' কথার প্রলেপ দিয়ে চাপা দিলে অগ্রগতি রোধ হয়, এবং বৈপরীত্য চলতেই থাকে (চিরতরে নয়, যতদিন আর কেউ সেই প্রতারণা লক্ষ্য না করে)। শেরিংটন পরিলক্ষিত এই বৈপরীত্য ও একটা গাণিতিক সংখ্যার স্ববিরোধ। এবং আমি যে ব্যাপারটাকে এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে গাণিতিক স্ববিরোধ আখ্যা দিয়েছিলাম তার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক না হলেও সম্বন্ধবদ্ধ বলে আমার বিশ্বাস। আগের কথাটা সংক্ষেপে ছিল, একই জগৎ অনেক মনের থেকে দানা বেঁধেছে। শেরিংটনের কথা হল একই মন অনেক কোষের প্রাণের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, কিম্বা বলা যায় বহু উপমস্তিষ্কের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, যেগুলির এমন একটা নিজস্ব মর্যাদা আছে বলে মনে হয় যে, আমরা সেগুলির সঙ্গে একটি করে উপমন যুক্ত আছে বলে ভাবতে উদ্যত হই। তবু আমরা জানি উপমনের ধারণাটা অত্যন্ত অবাস্তব, যেমন অবাস্তব বহুমনের ধারণা, কারো অভিজ্ঞতায় যার অস্তিত্ব নেই, কোনো ভাবেই কল্পনাও করা যায় না।

আমি মনে করি আমাদের প্রতীচ্যের বিজ্ঞান চিন্তার সঙ্গে প্রাচ্যের একত্ববাদের সঙ্গতি সাধন করে দু'টি স্ববিরোধেরই সমাধান পাওয়া যাবে (যদিও এখনই এখানে আমি তা করতে পারব বলতে চাই না)। মন তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যে একটি **Singulare Tantum**। আমি বলতে চাই সমগ্র মনের সংখ্যা মাত্র এক। তার সময়সূচীর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে আমি বলব অবিনশ্বর: কারণটা হল মন সর্বদা বর্তমান কালে বিরাজ করে। মনের কোনো অতীত বা ভবিষ্যৎ নেই। শুধু বর্তমান আছে—স্মৃতি ও আশা যার অঙ্গীভূত। কিন্তু আমি স্বীকার করছি আমাদের ভাষা এই সত্যের বর্ণনা দেবার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। যদি কেউ বলতে চান আমি এখন বিজ্ঞান বিষয়ে নয়, ধর্ম বিষয়ে কথা বলছি তাও আমি স্বীকার করব, কিন্তু সে ধর্ম বিজ্ঞান বিরোধী নয়, বরং নিরাসক্ত বিজ্ঞান গবেষণার সহযোগিতাই তাকে সামনে মেলে ধরেছে।

শেরিংটন বলেন: মানুষের মন আমাদের গ্রহের একটা সাম্প্রতিক সৃষ্টি।[1]

আমি স্বভাবতই একথা মানছি। যদি প্রথম কথাটি (মানুষের) বাদ দেওয়া হয় তবে মানব না। জগতের পরিণতি একমাত্র প্রতিফলিত করে যে সচেতন চিন্তাশীল মন, তা উদিত হয়েছে জগতের পরিণতির একটা পর্যায়ে একটা বিশেষ জৈবিক যন্ত্র সহযোগে এমন একটা চিন্তা শুধু অস্বস্তিকর নয়, অসম্ভব অদ্ভুত। সেই যন্ত্র কিছু বিশেষ ধরনের প্রাণীদের নিজেদের পালন করতে, রক্ষা করতে বংশপরম্পরায় চলমান হতে স্পষ্টতই সাহায্য করেছে। এই বিশেষ ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে। তার আগে অনেক অনেক প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা সেই বিশেষ যন্ত্র (মস্তিষ্ক) ছাড়াই বংশপরম্পরায় বেঁচে থেকেছে। প্রাণীজাতিগুলির সামান্য ভগ্নাংশ (প্রজাতিগুলির সংখ্যা গণনা করলেই বোঝা যাবে) 'একটা মস্তিষ্ক অধিকার'-এর উদ্যোগ নিয়েছে। সেই ঘটনা ঘটার আগে কি সমস্ত জগতের অভিনয় ঘটেছে শূন্য আসনের সামনে? যে জগৎ কারো কল্পনাতেও নেই, তার সম্বন্ধে এ কথাও কি বলা যায়? একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ যখন বহুযুগের পুরানো একটা শহর বা সংস্কৃতি পুনর্গঠন করেন, তখন প্রাচীন যুগের মানুষদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ থাকে—তখনকার মানুষদের কাজকর্ম, অনুভূতি, চিন্তাধারা, আনন্দ-দুঃখবোধের অভিব্যক্তির যে সব চিহ্ন সেখানে তখন

1. Man on his Nature, p. 218

পাওয়া যায় তাই খুঁজে দেখেন। কিন্তু যে জগৎ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ছিল, কোনো মনের যে সম্বন্ধে সচেতন চিন্তা কিছুই ছিল না, তা কি আদৌ কোনো কিছু বস্তু? তার কি কোনো অস্তিত্ব ছিল? কারণ, আমাদের ভুললে চলবে না: আমরা যে বলি জগতের পরিণতি বা অস্তিত্ব সচেতন মনের প্রতিফলন, একথাটা শুধু মাত্র একটা ক্লিশে (Cliche) বা গতানুগতিক পদসমষ্টি, একটা উক্তি একটা রূপকালঙ্কার যা আমাদের কাছে খুব পরিচিত হয়ে গেছে। জগৎটা একবারই হয়েছে কোনো কিছুই প্রতিফলিত হয় নি। বাস্তব এবং তার প্রতিবিম্ব একেবারে অভিন্ন। পৃথিবীর দেশকালে ব্যাপ্ত আমাদের একটা ধারণার প্রতিরূপ। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সামান্যতম কোনো সূত্র পাই না যা থেকে এছাড়া অন্য কিছু বলা যায়। ব্যাপারটা বার্কলে (Berkley) ভালভাবেই জানতেন।

জগৎ বহু লক্ষ বছর বিরাজ করে যে রোমাঞ্চর তাগিদে নিজেকেই দেখার জন্য মস্তিষ্কগুলিকে ঘটনাচক্রে সৃষ্টি করেছে তার একটা করুণ পরিণতি ঘটছে যা আবার শেরিংটনের ভাষাতেই ব্যক্ত করা যাক:

> আমরা শুনছি শক্তির জগৎ ক্রমশ ক্ষীয়মান। জগৎ একটা অন্তিমমুখী স্থিতাবস্থার দিকে চলেছে যেটা শেষ অবস্থা হবে। এই অবস্থায় প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবু প্রাণের বিবর্তন হয়ে চলেছে অবিরাম। আমাদের গ্রহ এবং তার পরিবেশ এর বিকাশ ঘটিয়েছে এবং ঘটাচ্ছে। তার থেকে মন বিকশিত হয়ে উঠেছে। মন যদি শক্তি পর্যায়গত ব্যবস্থা না হয়, তবে শক্তির অবক্ষয় কি করে মনকে প্রভাবিত করবে? তা কি অক্ষত থাকবে? আমরা এ পর্যন্ত জানি যে, সীমাবদ্ধ মন একটা ক্ষীয়মান শক্তি-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। যখন সেই শক্তির চলা থেমে যাবে, তার সঙ্গে যুক্ত মনের কি অবস্থা হবে? বিশ্বজগৎ যে সীমাবদ্ধ মনকে বিকশিত করেছে এবং করছে তাকে কি বিলুপ্ত হয়ে যেতে দেবে?[1]

এইসব চিন্তা কোনো কোনো দিক থেকে অস্বস্তিকর। সচেতন মন যে দ্বৈত ভূমিকা আয়ত্ত করেছে সেই ব্যাপারটাই আমাদের বিভ্রান্ত করে। একদিকে তা হল মঞ্চ, যেখানে পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা ঘটছে, অন্যদিকে সে একটা পাত্র যা এসব ধারণ করছে, এবং তার বাইরে কিছুই নেই। অপরপক্ষে এমন ধারণাও

1. Man on his Nature, p. 232

করা যায়, ধারণাটা ভুলও হতে পারে, যে জগতের এই কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে মন একটা বিশেষ অঙ্গ (মস্তিষ্ক)-র সঙ্গে যুক্ত। সমগ্র উদ্ভিদ ও জীবজগতের শারীরপ্রক্রিয়ার মধ্যে এই বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, কিন্তু এ যন্ত্র অদ্বিতীয় নয়, অনন্য নয় ; অন্যান্য নানা অঙ্গের মত এটা শুধু তার সত্ত্বাধিকারীদের জীবনধারণে সাহায্য করে এবং শুধুমাত্র তার ফলেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছে।

মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন শিল্পী তাঁর আঁকা মস্তবড় ছবির মধ্যে, বা কবি তাঁর দীর্ঘ কবিতার মধ্যে একজন সামান্য নগণ্য অধীন চরিত্ররূপে নিজেকে উপস্থিত করেন। এইভাবে ওডিসি-র (Odyssey) কবি নিজেকেই সম্ভবত অন্ধ গায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন, যে ফিসিয়ান (Phaeacian)-এর সভাঘরে ট্রয়ের যুদ্ধের সম্বন্ধে গান গেয়ে বিধ্বস্ত বীর নেতার চোখ অশ্রুসজল করে তুলেছিল। তেমনি নিবেলুং-দের (Nibelung) গানের মধ্যে অস্ট্রিয়া-র (Austria) পথ পার হবার সময় এক কবির দেখা পাই যাঁকে সমগ্র মহাকাব্যের লেখক বলে সন্দেহ হয়। ড্যুয়েরার (Dürer)-এর অল সেণ্টস্ (All Saints) ছবির মধ্যে আকাশে ত্রিরূপী ঈশ্বরকে ঘিরে দুই চক্রের মধ্যে দুই দল বিশ্বাসী ভক্তকে প্রার্থনারত দেখা যায়। আশীর্বাদধন্যদের একটা চক্র এবং পৃথিবীর মানুষদের একটা চক্র। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজারা, সম্রাটেরা, ধর্মযাজকদের শিরোমণিরা, এবং আমার ধারণা তার মধ্যে একজন নগণ্য পার্শ্বচরিত্ররূপে শিল্পী নিজেও আছেন, যাঁকে প্রায় দেখাই যায় না।

আমার মনে হয় এটা মনের দ্বৈতভাবের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ উপমা। একদিক থেকে মনই হল শিল্পী, যে সম্পূর্ণ কাজটা সৃষ্টি করছে ; কিন্তু সুসম্পন্ন করা কাজটির মধ্যে তা একটা নগণ্য সংযোজন মাত্র, যা না থাকলেও সমগ্র চিত্রটির পূর্ণ আবেদন ক্ষুণ্ণ হত না।

রূপকের ভাষায় না বললে আমাদের বলতেই হবে যে, এ ক্ষেত্রে আমরা এমন একটা বৈপরীত্যের দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হচ্ছি যেটা ঘটার কারণ হল আমরা আমাদের জগৎচিত্রের স্রষ্টাকে সরিয়ে না রেখে এখনও জগৎ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বোধগম্য দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারিনি। অর্থাৎ মনের সেখানে কোনো স্থান নেই। মনকে তার মধ্যে জোর করে প্রবেশ করাতে গেলে একটা অসম্ভব অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে ওঠে।

আগে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, এই একই কারণে, যে সব অনুভবের গুণগুলি জ্ঞাতা-কে গড়ে তোলে, বস্তুগত জগৎচিত্র সেই গুণগুলি বর্জিত হয়ে পড়ে। এই প্রতিরূপ বর্ণহীন, শব্দহীন এবং স্বাদহীন। এই ভাবেই এবং এই কারণেই সচেতন চিন্তা, উপলব্ধি ও অনুভবশক্তিসম্পন্ন সত্তার কাছে যা কিছু অর্থবহ, বিজ্ঞানের জগৎ সে সব কিছুরই অভাবগ্রস্ত, সে সব থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধ, নীতিবোধ বা যে কোনোরকম মূল্যবোধ—যা কিছু এই সমগ্র ঘটনাবলীর অর্থের সঙ্গে যুক্ত, তার কথাই আমি বলতে চাইছি। এইসব বিজ্ঞানের জগতে শুধু অস্তিত্বহীন তাই নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এদের অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করা সম্ভব নয়। যদি কেউ এসব আরোপ করতে চান, যেমনভাবে একজন শিশু তার রঙহীন ছবির বইতে রঙ দেয়, তবে তা কখনই সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। কারণ এই জগৎচিত্রে যদি জেদ করে জোর করে কেউ কিছু ঢোকাতে চায় তবে তা বৈজ্ঞানিক সত্য ঘোষণার রূপ নেবে ; এবং তা ভ্রান্ত হবে।

জীবন এমনিতেই মূল্যবান। 'জীবনকে শ্রদ্ধা কর। মর্যাদা দাও।' এই বলে অ্যালবার্ট সোয়াইটজার (Albert Schweitzer) তাঁর নৈতিক মূল্যবোধের মূল নির্দেশ গঠন করেছেন। প্রকৃতি এমন ব্যবহার করেছেন যেন 'প্রাণ' পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যহীন। লক্ষ লক্ষ প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে আর খুব তাড়াতাড়ি তারা বিনষ্ট হচ্ছে কিম্বা অন্য কোনো প্রাণীর খাদ্য আহরণের শিকার হয়ে উঠছে। এই প্রক্রিয়াই আসলে চিরনতুন জীবন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। 'কখনও অত্যাচার কোর না, ব্যথা দিও না' প্রকৃতি এই আদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁর প্রাণীরা অবিরাম পরস্পরকে আহত করে অবিরাম যুদ্ধ করার ওপরই নির্ভর করে আছে।

ভালো বা মন্দ বলে আসলে কিছুই নেই। চিন্তা করেই এই ধারণা তৈরি হয়। কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নিজস্ব চরিত্রে ভালোও নয়, মন্দও নয়, সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। মূল্যবোধটাই নেই। প্রকৃতি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন না। জার্মান ভাষায় আমরা যে বলি zweckmässig বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিসাধন, তা শুধু একটা কথার কথা বলে আমরা জানি। তার আক্ষরিক অর্থ যদি আমরা গ্রহণ করি তবে ভুল করব। এর মধ্যে শুধু কার্যকারণের যোগসূত্রই আছে।

এই সমগ্র দৃশ্যপরম্পরার প্রদর্শনীর তাৎপর্যের প্রশ্নে আমাদের বিজ্ঞানের জগতের সম্পূর্ণ নীরবতা সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার। যতই একাগ্রভাবে লক্ষ্য করি ব্যাপারটা ততই উদ্দেশ্যহীন ও হাস্যকর মনে হয়। যে দৃশ্যপট প্রদর্শন মন তার মানসিক উপলব্ধির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করছে স্পষ্টতই তার অর্থ একমাত্র চিন্তাশীল মনের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু এই যোগাযোগ সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদের যা বলছে তা স্পষ্টতই অসম্ভব। যেন যা সে এখন দেখছে, মন সেই ঘটনাপ্রবাহের সাহায্যেই তৈরি হয়েছে এবং সূর্য ঠাণ্ডা হয়ে পৃথিবী তুষার ও বরফের মরুভূমিতে পরিণত হলে সেই সঙ্গে মনও বিলীন হয়ে যাবে।

এবার সংক্ষেপে বিজ্ঞানের কুখ্যাত নাস্তিকতা সম্বন্ধে বলছি, যে বক্তব্য একই শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানকে বার বার এই অপবাদ সহ্য করতে হয় কিন্তু এ অপবাদ দেওয়া অন্যায়। ব্যক্তিভিত্তিক সব কিছুকে পরিত্যাগ করে যে জগৎ-চিত্রের প্রতিরূপ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে সেখানে কোনো ব্যক্তিরূপ ঈশ্বরের স্থান থাকতে পারে না। আমরা জানি ঈশ্বর অনুভূতির অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মত বা মানুষের ব্যক্তিত্বের মত একটা বাস্তব ঘটনা। সেগুলির মতই দেশকাল চিত্রে তার কোনো স্থান নেই। আমি দেশ-কাল-এর কোথাও ঈশ্বরকে পাই না—এই কথাই একজন সৎ প্রকৃতিবিজ্ঞানী বলবেন। এর ফলেই যাঁদের শিক্ষাপ্রণালীতে লেখা আছে ঈশ্বর হলেন আত্মা (God is spirit) তাঁদের কাছে সে বিজ্ঞানী নিন্দার্হ হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান ও ধর্ম

বিজ্ঞান কি ধর্মবিষয়ক ব্যাপারের কোনো খবরের সমর্থন দিতে পারে? যে সব ব্যাপকভাবে আলোচিত প্রশ্ন মানুষের মনকে প্রায়শই উদ্বেল করে তোলে, বিজ্ঞানের গবেষণা কি সে বিষয়ে কোনো যুক্তিসঙ্গত সন্তোষজনক দৃষ্টিভঙ্গী পেতে সাহায্য করতে পারে? আমাদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষত সুস্থ সুখী যুবক-যুবতীরা, অনেক কাল পর্যন্ত এ সব প্রশ্ন সরিয়ে রাখতে পারেন। অন্য অনেক প্রবীণ মানুষেরা এসব প্রশ্নের উত্তর নেই ভেবে নিজেদের সন্তুষ্ট করেন, তাই তাঁরা আর তা খোঁজার চেষ্টা করেন না। আবার আরও কেউ কেউ আছেন, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির এই অসঙ্গত অপারগতা যাঁদের চিরজীবন উতলা করে রাখে। তাঁরা হয়তো বহুকাল ধরে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের ভীতিও বহন করেন। 'অন্য জগৎ', 'মৃত্যুর পরের জীবন' এইসব প্রশ্ন এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির কথা আমি বলতে চাইছি। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, আমি **এসব** প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হব না। শুধু আরও সহজ একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হল, আমাদের অনেকের পক্ষে অপরিহার্য এই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পক্ষে কোনো খবর দেওয়া বা সাহায্য করা সম্ভব কিনা।

খুব আদিম সরল স্তরে তা নিশ্চয়ই সম্ভব—এবং কোনো বাদ-প্রতিবাদ না করে তা করাও হয়েছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, পুরানো কালের মুদ্রিত পৃথিবীর মানচিত্রে আমি স্বর্গ, নরক, এবং তার মধ্যবর্তী আশ্রয়ের স্থান চিহ্নিত দেখেছি—যে চিত্রে নরককে মাটির গভীর অতলে এবং স্বর্গকে উচ্চ আকাশে দেখানো হয়েছে। এই প্রতিরূপ শুধুমাত্র রূপক হিসাবে দেওয়া হয় নি (যা হয়ত পরবর্তী যুগে Dürer-এর All Saints ছবিতে দেওয়া হয়েছে); এ গুলিতে কোনো এক যুগের বহুল প্রচলিত অমার্জিত অপরিণত বিশ্বাসের নজির পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান যুগের কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠান তার অযৌক্তিক বদ্ধমূল মতবাদের এই রকম বস্তুগত প্রতিরূপ দিতে ধর্মবিশ্বাসীদের অনুরোধ করবে না, বরং তেমন দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে প্রতিহত করবে। নিশ্চয়ই পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান (তা যত সামান্যই হোক), আগ্নেয়গিরির প্রকৃতি, বায়ুমণ্ডলের উপাদান, সৌরমণ্ডলের সম্ভাব্য ইতিহাস, নক্ষত্রপুঞ্জ

এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে জ্ঞানই এই অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে। কোনো সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ অন্ধবিশ্বাসের মিথ্যায় রচিত এইসব স্থানকে আমাদের গবেষণা করা স্থানে স্থিত বলে ভাবেন না। এমন কি আমাদের গবেষণার পক্ষে অনধিগম্য অন্য কোনো অঞ্চলেও ওইসব কাল্পনিক স্থান আছে বলে মনে করবেন না; এ সবের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস থাকলেও তা অপ্রাকৃত অধ্যাত্ম স্তরের বলে মানবেন। আমি এ কথা বলবনা যে, তেমন গভীর ধার্মিক মানুষের জ্ঞানালোকের উপলব্ধি বিজ্ঞানের এইসব আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় থেকেছে। কিন্তু এ বিষয়ে জড়বাদী কুসংস্কার দূর করতে বিজ্ঞান সাহায্য করেছে।

অবশ্য এ সবই মনের একটা আদিম অবস্থার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। 'আমি প্রকৃতপক্ষে কে?' 'আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি?' এ সব দুর্লঙ্ঘ্য প্রশ্নাবলীর মোকাবিলা করতে বা অন্তত মনকে কিছুটা আশ্বস্ত করার জন্য আমার মতে কাল বা সময় সম্বন্ধে বিজ্ঞানে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা তাত্ত্বিক ধারণার রূপ সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। এই বিষয়ে ভাবতে গেলে তিনজন মানুষের নাম আমাদের মনে উদিত হয়। [যদিও আরও অনেকে, অনেক অবিজ্ঞানীও, সেই একই ধাঁচে চিন্তা করেছেন—যেমন হিপো-র (Hippo) সেণ্ট অগাস্টিন (St Augustine) এবং বিথিয়াস (Boethius)]। সেই তিনজন প্রধান মানুষ হলেন প্লেটো (Plato), কাণ্ট (Kant) এবং আইনস্টাইন (Einstein)।

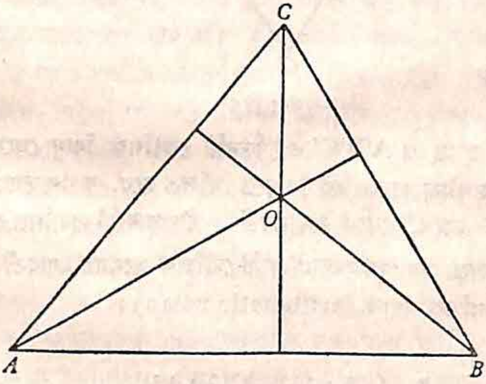
তিনজনের মধ্যে প্রথম দু'জন যদিও বিজ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের দর্শনের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে গভীর প্রগাঢ় অনুশীলন, পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁদের অবিচল আগ্রহী মনের উৎপত্তি বিজ্ঞান থেকেই হয়েছে। প্লেটোর ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা গণিত এবং জ্যামিতি ('এবং' কথাটা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর সময়ে ছিল) থেকে এসেছে। কোন বিশেষ গুণ প্লেটোর জীবনের কাজকে এমন অদ্বিতীয় মহিমায় ভাস্বর করেছে যা দু'হাজার বছর পরেও অনির্বাণ জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল? তাঁর খ্যাতি সংখ্যাতত্ত্বের বা জ্যামিতির চিত্রের বিষয়ে কোনো বিশেষ আবিষ্কারের জন্য নয়। পদার্থবিজ্ঞানের বস্তুজগৎ বা প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অলীকত্ব জড়িত ছিল এবং অনেকের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল, যাঁদের কেউ কেউ তাঁর চেয়ে এক শতাব্দীরও পূর্বে জন্মেছেন (Thales-এর ঋষিগণ থেকে Democritus

পর্যন্ত)। প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানকে তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল (Aristotle) ও থিওফ্রেস্টাস (Theophrastus) অনেক বেশি দূর পর্যন্ত অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর অতি অনুগত ভক্তরা ছাড়া আর সকলের কাছেই তাঁর বিস্তৃত কথোপকথনের অধ্যায়গুলিকে কিছু ভিত্তিহীন কথার মারপ্যাঁচ বলে মনে হবে। কোনো কথার অর্থ বা সংজ্ঞা পাবার কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় না; যেন একটা এমন বিশ্বাস কাজ করছে, যে, কথাগুলিকে নানাভাবে অনেকক্ষণ ঘোরাতে থাকলে, তারা নিজেরাই তাদের অর্থ মেলে ধরবে। তাঁর ত্রুটিশূন্য সামাজিক রাজনৈতিক স্বপ্নরাষ্ট্র-র (Utopia) পরিকল্পনা বিফল হয়েছিল এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা রূপায়িত করতে গিয়ে তাঁকে গুরুতর বিপদে পড়তে হয়েছিল; আজকের দিনেও সামান্য যে কয়েকজন এ প্রচেষ্টার অনুরাগী তাঁদেরও সেইরকমই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। তবে তাঁর খ্যাতির কারণ কি?

আমার মতে কারণটা হল তিনিই প্রথম যুক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আদি-অন্তহীন অস্তিত্বের ধারণাকে একটা সত্য বলে বিবেচনা করে, সব প্রকৃত অভিজ্ঞতার চেয়েও বেশি সত্য বলে সজোরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বলেছেন সব বাস্তব অভিজ্ঞতা সেই সত্যের ছায়ামাত্র, সেই সত্য থেকে গৃহীত। আমি তাঁর রূপগত বা ভাবগত তত্ত্ব-(Theory of Forms or Ideas) এর কথা বলছি। এই তত্ত্বের উৎপত্তি কোথা থেকে হল? নিঃসন্দেহে Parmenides এবং Eleatics-দের শিক্ষার সংস্পর্শ তাঁকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু এ কথাও নিশ্চিত যে, প্লেটোর কাছে তা একটা সজীব সমধর্মী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। ব্যাপারটা প্লেটোর নিজেরই একটা উপমার কথা মনে করিয়ে দেয়—তা হল, যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানলাভ করার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যে জ্ঞান আগে থেকেই ছিল তা স্মরণ করা, সম্পূর্ণ নতুন কিছু আবিষ্কার করা নয়। যাই হোক, Parmenides-প্রবর্তিত অনন্ত, অপরিবর্তনীয়, সর্বব্যাপী সত্তার ধারণা প্লেটোর মনে 'ধারণা রাজ্য'-রূপে (Realm of Ideas) আরও শক্তিশালী চিন্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও এ চিন্তা মানুষের কল্পনার ক্ষেত্রে আবেদন জাগায়, তবুও প্রধানত তা রহস্যময়তাতেই থেকে যায়। কিন্তু আমার মনে হয় এই চিন্তা একটা অত্যন্ত সত্য অভিজ্ঞতা উদ্ভূত। তিনি সংখ্যা ও জ্যামিতিক চিত্রের জগৎ উপলব্ধি করে বিস্ময়াভিভূত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর পরে আরও অনেকেই হয়েছেন এবং পাইথাগোরাস (Pythagoras)-এর অনুগামীরা আগেই

হয়েছিলেন। প্লেটো তাঁর এই উপলব্ধির যে প্রকৃতি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তা হল, এগুলি বিশুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত যুক্তির পথে নিজেদের মেলে ধরে আমাদের এসব সত্য সম্পর্কগুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয় যার সত্যতা শুধু খণ্ডন করা যায় না তাই নয়, এসব নিশ্চিতভাবে চিরকাল ব্যাপ্ত ; সম্পর্কগুলি ছিল এবং থাকবে, আমাদের সেগুলির বিষয় অনুসন্ধান করা বা না করার ওপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। গাণিতিক সত্য অনাদি অনন্ত, তা আমরা যখন আবিষ্কার করছি তখন উদিত হচ্ছে না। তবু সেই আবিষ্কার একটা সত্য ঘটনা, একটা আবেগের অনুভূতি ; যেন কোনো পরীর কাছ থেকে পাওয়া একটা উপহার।

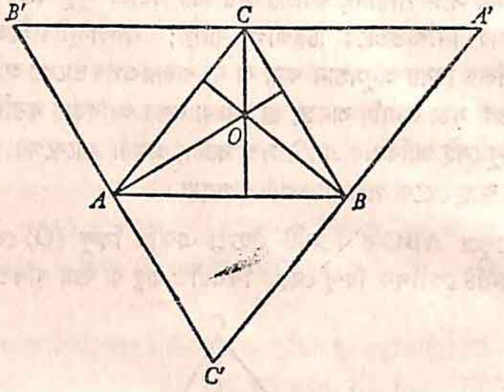
একটি ত্রিভুজ ABC-র তিনটি উচ্চতা একটি বিন্দু (O) তে মিলিত হয়। উচ্চতা হল তিনটি কৌণিক বিন্দু থেকে বিপরীত বাহু বা তার বর্ধিত অংশের উপর



১নং চিত্র

লম্ব। প্রথম দৃষ্টিতে কেউ ঠিক ভাবতে পারবে না কেন এমন হয়। যে কোনো তিনটি সরলরেখার ক্ষেত্রে এমন হয় না। তারা সাধারণত একটা ত্রিভুজ গঠন করে। প্রতিটি কৌণিক বিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রতিটি বিপরীত বাহুর সমান্তরাল ভাবে তিনটি সরলরেখা টানা যাক, যাতে A′B′C′ এই বড় ত্রিভুজটি সৃষ্টি হয়। এটি চারটি সর্বসম ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত। ABC-র তিনটি উচ্চতা বড় ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দু থেকে লম্ব বা তাদের সুমিতি রেখা (symmetry line)। যে লম্ব C

থেকে টানা হচ্ছে তার সব বিন্দুগুলিই A′ এবং B′ থেকে সমদূরবর্তী ; B বিন্দু থেকে টানা লম্বর বিন্দুগুলি তেমনি A′ এবং C′ থেকে সমদূরবর্তী। সুতরাং যে বিন্দুতে এই



২নং চিত্র

লম্ব দু'টি মিলিত হচ্ছে তা A′B′C′ এই তিনটি কৌণিক বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী। সুতরাং A থেকে টানা লম্বও এই বিন্দুতে মিলিত হবে, কারণ তাতে যে সব বিন্দু আছে সেগুলি B′ এবং C′ থেকে সমদূরবর্তী। উপপাদ্যটি প্রমাণিত হল।

1 এবং 2 ছাড়া সব পূর্ণ সংখ্যাই দু'টি মৌলিক সংখ্যার মধ্যবর্তী হয়, অর্থাৎ তা সংখ্যা দু'টির গাণিতিক মধ্যক (arithmetic mean)।

উদাহরণ :

$$8=\tfrac{1}{2}(5+11)=\tfrac{1}{2}(3+13)$$
$$17=\tfrac{1}{2}(3+31)=\tfrac{1}{2}(29+5)=\tfrac{1}{2}(23+11)$$
$$20=\tfrac{1}{2}(11+29)=\tfrac{1}{2}(3+37)$$

দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণত একাধিক সমাধান সম্ভব। এই নিয়মের নাম গোল্ডবাখ-(Goldbach) এর উপপাদ্য। এবং এই গাণিতিক সম্বন্ধকে সর্বদা সত্য বলে মানা হয়, যদিও তা প্রমাণিত হয় নি।

ধারাবাহিক বিজোড় সংখ্যা যোগ করলে যোগফল সব সময়েই একটা বর্গসংখ্যা হয়। যেমন : প্রথমে শুধু 1 তারপর $1+3=4$, তারপর $1+3+5=9$ এবং

1+3+5+7=16 ইত্যাদি। এইভাবে আসলে সব বর্গসংখ্যা পাওয়া যায়। এবং সব সময়েই যতগুলি বিজোড় সংখ্যা যোগ দেওয়া হয় সেই সংখ্যাটির বর্গ হয়। এই নিয়মের সত্যতা বুঝতে গেলে যোগটির মধ্যবর্তী স্থান থেকে সমদূরবর্তী সংখ্যা-যুগলের (প্রথম ও শেষ, প্রথমের ঠিক পরে এবং শেষের ঠিক আগে ইত্যাদি) স্থানে তাদের গাণিতিক মধ্যক স্থাপন করা যাক ; তা নিশ্চয়ই যতগুলি সংখ্যা যোগ করা হচ্ছে তার সমান হবে ; যেমন পূর্বোল্লেখিত শেষ উদাহরণটির ক্ষেত্রে :

$$4+4+4+4=4\times4$$

এবারে কাণ্ট-এর কথায় আসা যাক। কাণ্ট স্থান ও কালের স্বরূপের ভাববাদী-ধর্মিতার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেটা তাঁর শিক্ষার একটি মূলগত অংশ বা বলা যায় সর্বাপেক্ষা মূলগত অংশ। এ কথা প্রায় সর্বজনবিদিত হয়ে গেছে। কাণ্ট-এর বেশির ভাগ কথার মতই এ কথাও প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু সে কারণে এ বিষয়ে আগ্রহ চলে যায় না। (বরং বেড়ে যায়। কারণ 'ঠিক বা ভুল' প্রমাণিত হলে তা অতি সাধারণ ব্যাপার হত)। বক্তব্যটা হল : স্থানে ব্যাপ্ত এবং নির্দিষ্ট কালক্রমে বিস্তৃত 'পূর্বাপর' ঘটনা আমাদের দৃষ্ট জগতের নিজস্বগুণ নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি গ্রহণকারী মনের এলাকার অধিকারভুক্ত ব্যাপার ; মনের আজ পর্যন্ত যা গঠন আছে তাতে স্থান ও কাল এই দুই তালিকায় না ফেলে কোনোমতেই কোনো ঘটনাকে মন নথিভুক্ত করতে পারে না। তার মানে এই নয় যে, মন কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাব ছাড়া বা কোনো অভিজ্ঞতার আগে থেকেই এই পূর্বাপর কালক্রমসূচী আত্মস্থ করে। শুধু সামনে যা এসে পড়ে সে সম্বন্ধে এইভাবে ধারণা না করা বা পরবর্তী অভিজ্ঞতায় এইভাবেই প্রয়োগ না করা মনের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষত অনেকে যেমন বিশ্বাস করেন স্থান ও কাল একটা নির্দিষ্ট ক্রমপর্যায় বিন্যস্ত রূপে সেই 'নিজস্ব মূর্ত বস্তু'-তে নিহিত থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা ঘটায়, সে ধারণারও কোনো আভাস বা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বাসটা যে একেবারেই অন্তঃসারশূন্য তা প্রমাণ করা শক্ত নয়। কোনো ব্যক্তি কখনও তার দৃষ্টজগৎ এবং যে বস্তু সে দৃশ্যের কারণ সে দু'টিকে পৃথক করে দেখতে পারেন না। কারণ এ বিষয়ে তিনি যতই পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আয়ত্ত করুন, ঘটনাটা তাঁর ক্ষেত্রে একবারই ঘটছে, দু'বার নয়। দ্বৈতভাবটা একটা রূপক, যেটা মনে উদিত হয় অন্যান্য মানুষ বা জীবজগতের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে। ফলে মনে হয় তাদের

দেখা বা নিজের দেখাটা প্রায় একই রকমের, শুধু একটা তফাৎ হল দৃষ্টিকোণের বা প্রক্ষেপক্ষেত্রের। যদি ধরাও যায় যে, এতদ্বারা আমরা একটা নিরপেক্ষ বাস্তব জগৎ কল্পনা করতে বাধ্য হব, যে জগৎ আমাদের সব দৃষ্ট ও অনুভূত অভিজ্ঞতার কারণ (যেমন বেশির ভাগ মানুষ ভাবেন), তবেই বা আমরা কেমন করে স্থির করব আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার মধ্যে সাধারণ চরিত্রটা আমাদের মনের গঠনের বৈশিষ্ট্যের জন্য না বস্তুজগতের একটা নিজস্ব গুণ, যা সব বস্তুর মধ্যে আছে তার জন্য ? আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিই বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পাবার একমাত্র উপায়, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এই বস্তুনিষ্ঠ জগৎ প্রকৃতিতে স্থিত হলেও একটা প্রকল্প হয়েই থাকছে। আমরা যদি এ ধারণা গ্রহণ করি তবে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বহির্জগতের যে সব বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাচ্ছে তা আমাদের নিজেদের প্রতি আরোপ না করে বহির্জগতের প্রতি আরোপ করাটাই কি স্বাভাবিক হবে না ?

কিন্তু 'জগৎ সম্বন্ধে মনের ধারণা' গঠনের পথে মন এবং তার অনুভূত জগৎ-এর পারস্পরিক ভূমিকা যথাযথভাবে বণ্টন করাতেই কাণ্ট-এর বক্তব্যের মহান গুরুত্ব নিহিত নেই। কারণ আগেই বলেছি এই দুইয়ের প্রভেদ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। মন বা জগৎ এই 'একীভূত বস্তু'টার একটা অন্যরকম চেহারা হওয়া সম্ভব যা আমাদের দেশকাল এর ধারণার অন্তর্গত নয়, যা আমরা ধরাছোঁয়ার অন্তর্গতভাবে আয়ত্ত করতে পারব না, এই ধারণা গড়ে তোলাটাই কাণ্ট-এর বিরাট কীর্তি। অর্থাৎ একটা বদ্ধমূল সংস্কার থেকে প্রবলভাবে আমাদের মুক্তি দেওয়া হল : দেশকাল সম ছাড়া অন্য স্তরের আকৃতি থাকা সম্ভব। আমার মনে হয় শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer)-ই প্রথম কাণ্ট-এর কথার মধ্যে এই বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিলেন। আমাদের সাধারণভাবে জানা জগতের অভিজ্ঞতায় যে সব ফল ঘটে বা সাধারণ চিন্তা যা নির্ভুলভাবে ব্যক্ত করে সে সবের বিরুদ্ধতা না করেও এ মুক্তি ধর্মীয় অর্থে বিশ্বাস পাবার পথ খুলে দিচ্ছে। যেমন, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল—অভিজ্ঞতা উপলব্ধির ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের অবগত জ্ঞান, আমাদের দেহের বিনাশের পর সেই ক্ষমতার অস্তিত্বই থাকবে না এমন একটা অবাঞ্ছিত বিশ্বাস দৃঢ়মূল করে দেয়, কারণ প্রাণ বলতে আমরা যা বুঝি তা দেহের প্রাণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তবে কি এই জীবনের পর কিছুই নেই ? না, যেভাবে আমরা দেশকাল ব্যাপ্ত ভাবে অভিজ্ঞতা উপলব্ধিকে বুঝি সে ভাবে থাকতে পারে না। কিন্তু প্রতীয়মানতার যে রকম

বিন্যাসে সময় কোনো ভূমিকা পালন করে না, সে ক্ষেত্রে 'পরে' এই কথাটার কোনো মানে নেই। বিশুদ্ধ চিন্তা কখনই আমাদের এ আশ্বাস দেবে না যে তেমন কিছুর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এইরকম চিন্তা তেমন সম্ভাব্যতার ধারণা গড়ে তোলার আপাত বাধাকে দূর করতে পারে। কাণ্ট তাঁর বিশ্লেষণ দিয়ে ঠিক তাই করেছেন। এবং আমার মতে সেইখানেই কাণ্ট-এর দর্শনের গুরুত্ব।

এই প্রসঙ্গে এখন আমি আইনস্টাইন সম্বন্ধে বলব। বিজ্ঞান বিষয়ে কাণ্ট-এর ধারণা অবিশ্বাস্যরকম অপরিণত ছিল। তাঁর **Metaphysical Foundation of Science** (Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft) -এর পাতা উল্টে দেখলেই একথা স্বীকার করতে হবে। পদার্থবিদ্যা তাঁর জীবিতকালে (1724-1804) যে অবস্থায় ছিল সেটাই শেষ কথা ধরে নিয়ে তাঁর বক্তব্যগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে কাণ্ট উদ্যত হয়েছিলেন। একটি বিরাট প্রতিভাধর দার্শনিকের এমন অবস্থা ভবিষ্যতের দার্শনিকদের একটা বিপদ সঙ্কেত হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। তিনি সহজভাবে দেখিয়েছেন দেশ বা স্থান নিশ্চিতভাবে অসীম, এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন যে মানুষের মনের গঠনের মধ্যেই ইউক্লিড-সংকলিত জ্যামিতিক নিয়মাবলী নিহিত আছে। এই ইউক্লিডীয় দেশে পদার্থের একটা শম্বুক ঘুরে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন করছে। কাণ্ট অথবা তাঁর যুগের যে কোনো পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে স্থান এবং কাল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে পরিগণিত হত। তাই স্থানকে আমাদের বাহ্যিক স্বজ্ঞা (intuition) এবং কালকে আন্তরিক স্বজ্ঞা (Anschauung) বলতে তাঁর কোনো দ্বিধা হয় নি। স্থানের ইউক্লিড কল্পিত অসীম ব্যাপ্ত দেশ যে আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎকে বোঝার পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং কালকে যে চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্রে অবিছিন্ন ধারারূপে আরও ভাল করে বোঝা যায় এই জ্ঞানের অভাব কাণ্ট-এর চিন্তাধারার ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর দর্শনের আরও মূল্যবান দিকের কিছুই ক্ষতি করতে পারে নি।

এই নতুন জ্ঞান উন্মোচন আইনস্টাইন [এবং আরও অনেকে, যেমন এইচ. এ. লোরেঞ্জ (H. A. Lorentz), পঁয়কেয়ারে (Poincare'), মিনকাউস্কি (Minkowski) ইত্যাদি]-এর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাঁদের আবিষ্কার দার্শনিকদের, সাধারণ মানুষদের, এবং ঘরের মহিলাদের ওপর যে দুর্দম প্রভাব বিস্তার করেছে তার কারণ হল : দেশ-কাল সম্বন্ধ ব্যাপারটার বিষয়ে কাণ্ট-এর ধারণা বা তাঁর পরবর্তী

যুগের অন্য সমস্ত পদার্থবিদ্, সাধারণ মানুষ, ঘরের মহিলা সকলের ধারণার থেকে অনেক বেশি জটিল সেই জ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যে তাঁরা নিয়ে এসেছেন।

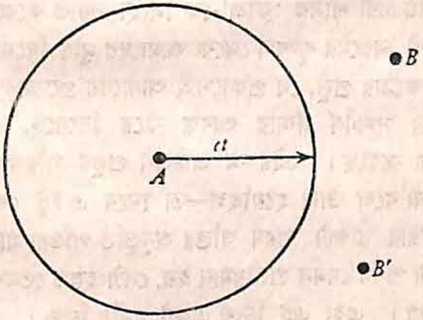
সময় বা কাল সম্বন্ধে আমাদের পূর্বতন ধারণার ওপরই এই নতুন জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিকোণ সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। 'পূর্ব' এবং 'পর' এর ধারণাই হল সময়। নতুন চিন্তাধারার উৎস নিম্নলিখিত দু'টি মূলে নিহিত :

(1) 'পূর্বে' এবং পরে'র ধারণা কার্যকারণ সম্পর্কতেই স্থিত। আমরা জানি, অন্তত আমরা এইরকম ধারণা গড়ে তুলেছি যে, একটা ঘটনা A আর একটা ঘটনা B-কে ঘটাতে পারে। অন্তত তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারে যাতে A না থাকলে B থাকবে না। অন্তত সেই পরিবর্তিত রূপে থাকবে না। যেমন, ধরা যাক যখন কামানের গোলা ফাটে, একটি মানুষ তার ওপর বসে থাকলে তার মৃত্যু হয় ; উপরন্তু সেই গোলা ফাটার শব্দ নানা দূরের স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণ এবং মৃত্যু হয়ত যুগপৎ ঘটতে পারে তবে দূরে শব্দ শোনাটা পরে ঘটবে ; কিন্তু কোনো প্রভাবই ঘটনার আগে ঘটতে পারে না। এটা একটা মূলগত ধারণা। অন্তত প্রাত্যহিক জীবনে এই ধারণার থেকেই দু'টি ঘটনার মধ্যে কোন্‌টি পরে ঘটেছে বা অন্তত আগে ঘটে নি সেই প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়। কারণের আগে ফল কখনও হয় না এই ধারণার ওপরই এই পার্থক্যের ভিত্তি। A-র কারণেই B ঘটেছে এ কথা ভাবার যদি আমাদের যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, অন্তত B, A-র কোনো চিহ্ন বহন করে, অথবা কোনো ঘটনার নজির থেকে জানা যায় যে কোনো চিহ্ন বহন করা সম্ভব, তবে B কখনও A-র আগে ঘটতে পারে না।

(2) এই কথাটা মনে রাখা যাক। দ্বিতীয় মূলগত কথা হল পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, কার্য কখনও যে কোনো অনির্দিষ্ট উচ্চ গতিবেগে বিস্তারলাভ করতে পারে না। তার একটা ঊর্ধ্বসীমা থাকে, শূন্যে আলোর গতিবেগই সেই ঊর্ধ্বসীমা। মানবিক পরিমাপে এ গতিবেগ অত্যন্ত বেশি—বিষুবরেখা ধরে পৃথিবীর চারপাশে এক সেকেণ্ডে সাতবার ঘুরে আসার সমান। অত্যন্ত বেশি, কিন্তু অসীম নয়। এই গতিবেগকে c বলা যাক। এটা প্রকৃতির একটা মূলগত সত্য বলে স্বীকার করা যাক। এর থেকে দেখা যাবে যে, 'পূর্বে ও পরে' বা 'অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্‌বর্তী'র মধ্যে পার্থক্য, যা কার্যকারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তা সর্বক্ষেত্রে

প্রযোজ্য নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ নিয়ম ভেঙে যায়। ব্যাপারটা অঙ্কের ভাষায় ছাড়া সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার কারণ এই নয় যে, অঙ্কের পদ্ধতিটা জটিল। আসলে আমাদের প্রতিদিনের ভাষা কাল এর প্রথাগত ধারণার প্রতি এত পক্ষপাতিত্ব করে গড়ে উঠেছে যাতে কোনো ক্রিয়াপদ (Verbum, 'the' word, Germ, zeitwort) ব্যবহার করাই যাবে না যা ক্রিয়ার কোনো না কোনো কাল বোঝাবে।

একটা সবচেয়ে সহজ (তবে দেখা যাবে হয়ত সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়) পন্থা এইভাবে নেওয়া যায় : ধরা যাক A একটি ঘটনা। পরবর্তী কোনো সময়ে A-কে পরিবেষ্টন করা ct ব্যাসার্ধের একটি গোলকের বাইরে আর একটি ঘটনা B কল্পনা করা যাক। তবে B, A-র কোনো চিহ্ন দেখাতে পারবে না। সুতরাং আমাদের বিচারের মানদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে। যে ভাষা আমরা ব্যবহার করছি তাতে অবশ্য B-কে আমরা পরের ঘটনা বলে উল্লেখ করছি। কিন্তু আমরা কি কথাটা ঠিক বলেছি? কারণ দু'দিক থেকেই তো পূর্বাপর নির্ণয় করার শর্ত ভেঙ্গে গেছে।



৩নং চিত্র

একই গোলকের বাইরে আর একটি ঘটনা B′, t সময় আগে ঘটেছে বলে ভাবা যাক। এ ক্ষেত্রেও আগের মত B′-এর কোনো চিহ্ন A-তে পৌঁছতে পারবে না। এবং নিশ্চয়ই A থেকেও কোনো কিছু B-তে দেখা যাবে না।

অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই ঠিক একই রকম পারস্পরিক প্রভাবহীনতার সম্পর্ক থাকছে। কার্যকারণ সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে A-র সঙ্গে B শ্রেণীর ঘটনা এবং B′ শ্রেণীর ঘটনার

কল্পনার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। সুতরাং আমরা যদি নিত্যব্যবহৃত ভাষার সংস্কার বর্জন করে এই সম্পর্ককেই 'পূর্ব এবং পর'-এর ধারণার ভিত্তি করে তুলি তবে B এবং B' এমন শ্রেণীর ঘটনা হবে যেগুলি A-র থেকে আগেও ঘটে নি পরেও ঘটে নি। যে 'দেশকাল'-এর অঞ্চল জুড়ে এই শ্রেণীর ঘটনার অবস্থিতি তাকে 'সম্ভাব্য যুগপত্তার অঞ্চল' বলা যায় (A ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে)। এই কথাটা বলা হল কারণ দেশকালের এমন কাঠামোও গঠন করা সম্ভব যাতে A-কে একটা ইচ্ছেমত বিশেষ B বা B'-এর সঙ্গে যুগপৎ ঘটার উপযোগী করে নেওয়া যায়। এই হল আইনস্টাইনের আবিষ্কার (যার নাম বিশেষ আপেক্ষিকবাদ, 1905)।

এসব আমাদের পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এখন একটা অত্যন্ত বাস্তব সত্য হয়ে গেছে, আমরা এসব প্রতিদিনের কাজে ব্যবহার করি—যেমন আমরা গুণের নামতা বা সমকোণী ত্রিভুজ সম্বন্ধে পাইথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার করে থাকি। আমি প্রায়ই ভেবে অবাক হই কেন এই তত্ত্ব জনসাধারণ এবং দার্শনিকদের মনকে এত নাড়া দিয়েছিল। আমার মনে হয় কারণটা হল, এই তত্ত্ব আমাদের ওপর বাইরে থেকে চাপানো স্বেচ্ছাচারী শাসক 'কাল'-কে সিংহাসনচ্যুত করেছে—'পূর্ব এবং পর'-এর অক্ষয় অবিনাশী নিয়মের শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। সত্যিই কাল আমাদের সবচেয়ে কঠোর প্রভু, যে প্রকাশ্যেই আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বকে 70 বা 80 বছরের একটা সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে দিয়েছে, যেমন পেনটাটিউখ (Pentateuch)-এ রয়েছে। ওইরকম একজন প্রভুর পরিকল্পনা—যা কিছুতেই আক্রমণ করা যায় না বলে ভাবা হয়েছিল—তা নিয়ে একটু খেলতে পারা, অল্প একটুও খেলা করায় একটা পরম স্বস্তির অনুভূতি পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে অমোঘ 'সময়সূচী'টা প্রথম যেমন প্রতীয়মান হয়, সেটা হয়ত তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, মনে এই আশ্বাস জাগায়। এবং এই চিন্তা একটা ধর্মীয় চিন্তা। আমি বলব একমাত্র ধর্মীয় চিন্তা।

অনেক সময় শোনা যায় আইনস্টাইন কাণ্ট-এর দেশকালের ভাববাদীতার গভীর তত্ত্বচিন্তাকে মিথ্যা করে দিয়েছেন। কথাটা ঠিক নয়। আইনস্টাইন তা করেন নি। তিনি বরং সেই চিন্তাকে সফল করার পথে একটা দীর্ঘ পদক্ষেপ ফেলেছেন।

আমি দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্লেটো, কাণ্ট এবং আইনস্টাইনের প্রভাব সম্বন্ধে বলেছি। কিন্তু কাণ্ট এবং আইনস্টাইনের মধ্যবর্তী যুগে, আইন-

স্টাইনের প্রায় এক প্রজন্ম আগে পদার্থবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে যা হয়ত দার্শনিক, সাধারণ মানুষ এবং ঘরের মহিলাদের আপেক্ষিকবাদের চেয়েও বেশি না হলেও অন্তত সেইরকমই নাড়া দেবার মত করে তৈরি হয়েছিল। তা যে হয় নি তার কারণ হল সেই চিন্তাধারা বোঝা আরও কঠিন এবং শুধু দু'একজন দার্শনিক ছাড়া হয়ত পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর মানুষদের পক্ষেই বোঝা আরও বেশি কঠিন। এই ঘটনার সঙ্গে মার্কিন বিজ্ঞানী উইলার্ড গিব্‌স্ (Willard Gibbs) এবং অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী লুডউইগ বোল্টস্‌মান-এর (Ludwig Boltzmann) নাম যুক্ত। এ সম্পর্কে এখন আমি কিছু বলব।

খুব কম কিছু ব্যতিক্রম (যা সত্যিই বিশেষ ব্যতিক্রম) ছাড়া প্রকৃতির সব ঘটনার গতিই একমুখী, বিপরীতমুখী হয় না। আমরা যদি বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করা ঘটনাপ্রবাহের ঠিক বিপরীতমুখী কালক্রম কল্পনা করি, উল্টোদিকে চলচ্চিত্র চালালে যেমন হবে—তেমন বিপরীতমুখী ঘটনাক্রম কল্পনা করা সহজ, কিন্তু তা ব্যাপকভাবে পদার্থবিজ্ঞানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলির বিরুদ্ধে যাবে।

গতিবিদ্যা এবং সংখ্যায়নভিত্তিক তাপতত্ত্বের সাহায্যে সব ঘটনার সাধারণ 'অভিমুখত্ব'র ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে। এবং এই ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের সবচেয়ে প্রশংসনীয় কীর্তি বলে অভিনন্দিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের এই তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এখানে দেব না। এই ব্যাখ্যার সারাংশ বোঝার জন্য তার প্রয়োজনও নেই। 'অবিপরীতগামিতা' যদি অণু-পরমাণুর আণুবীক্ষণিক পরিমাপের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত মূলগত ধর্ম বলে পরিগণিত হত তবে এ ব্যাখ্যা খুবই অকিঞ্চিৎকর হত। সেটা মধ্যযুগের বহু বাকসর্বস্ব ব্যাখ্যার চেয়ে ভাল হত না—যেমন আগুন আগ্নেয়গুণের জন্যই উষ্ণ। বোল্টস্‌মান-এর মতানুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো বিন্যস্ত অবস্থা নিজে থেকেই অবিন্যস্ত অবস্থায় পৌঁছনর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তার বিপরীত দিকে যায় না।

উপমা হিসাবে একসেট তাসের কথা ধরা যাক। ধরা যাক সে তাসের সেটকে আপনি 7, 8, 9, 10, গোলাম, বিবি, সাহেব, হরতনের টেক্কা তারপর সেইভাবে রুইতন ইত্যাদিতে সযত্নে বিন্যস্ত করলেন। এই সাজানো তাসের সেটকে যদি আপনি একবার, দুবার, তিনবার শাফ্‌ল (shuffle) বা অবিন্যস্ত করেন তবে ক্রমশ প্রাথমিক বিন্যাস এলোমেলো হয়ে যাবে। কিন্তু এটা শাফ্‌ল্ করার

পদ্ধতির সহজাত ধর্ম নয়। প্রথম শাফ্‌ল্-এর ফলে তাসের সেটে যে অবিন্যস্ত অবস্থা ঘটেছে আরও শাফ্‌ল্ প্রক্রিয়া সে ফল কাটিয়ে আবার সেই প্রাথমিক বিন্যাস ফিরিয়ে আনতে পারবে এমন কল্পনা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে, কিন্তু সকলেই প্রথম রকমটাই ঘটবে আশা করেন, কেউই ভাবেন না দ্বিতীয় রকমটা ঘটবে। অবশ্য দৈবাৎ যদি তেমন ঘটে সে জন্য তাঁর অত্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার একমুখী চরিত্রের বোল্টস্‌মান-কৃত ব্যাখ্যার এই হল সংক্ষিপ্তসার (প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের ইতিহাসও অবশ্য এর অন্তর্ভুক্ত)। 'সময়ের তীর' (এডিংটনের ভাষায়) আমাদের তাসের শাফ্‌ল্-এর উপমার মতন যান্ত্রিক পদ্ধতি পরিচালিত নয় সেটা প্রদর্শন করাই এই ব্যাখ্যার প্রধান গুণ। এই ঘটনা, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অতীত-ভবিষ্যতের ধারণার কোনো স্থান নেই। স্বপ্রকৃতিগতভাবে ঘটনার গতি এক অভিমুখ ও তার বিপরীত দিকে সম্পূর্ণ সমভাবে চলতে পারে। 'তীর' বা অতীত ভবিষ্যতের ধারণা সমষ্টির সমাবেশের (সংখ্যায়ন) তাত্ত্বিক বিচারের ফলশ্রুতি। আমাদের তাসের উপমার প্রধান ব্যাপার হল যে, শুধু একটি বা কয়েকটি মাত্র সুবিন্যস্ত অবস্থা আছে, কিন্তু অবিন্যস্ত অবস্থা লক্ষ কোটি রকমের আছে।

তবু এই তত্ত্বের বার বার বিরোধিতা করা হয়েছে। মাঝে মাঝে খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও তা করেছেন। বিরোধিতার কারণ এইরকম : এই তত্ত্ব যুক্তিগত অসারতাদুষ্ট। বলা হচ্ছে যে, যদি মূল পদ্ধতিতে কাল-এর দুই অভিমুখের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকে এবং যদি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতিসাম্য বজায় থাকে, তবে সেইরকম ঘটনার অনেকগুলির সহযোগিতার সমষ্টিতে উৎপন্ন সমগ্র অবস্থার এক অভিমুখের প্রতি কেন এই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব থাকবে? যা কিছু এক অভিমুখের পক্ষে প্রযোজ্য তা তো বিপরীত অভিমুখ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য।

এই যুক্তিবিচার যদি নির্ভরযোগ্য হয় তবে তার পরিণতি মারাত্মক হবে বলে আমার মনে হয়। কারণ তত্ত্বটির প্রধান গুণ বলে বিবেচিত দিকটির প্রতিই এই আক্রমণের লক্ষ্য। সেটি হল : অপক্ষপাতীভাবে পরস্পরবিপরীত অভিমুখগম্য মূলগত ক্রিয়াপদ্ধতি থেকে অবিপরীতগম্য ঘটনা আহরণ করা।

কালকে যেহেতু প্রথম থেকেই প্রতিসমভাবে পরিবর্তনশীল রাশি বলে গণ্য করা হয়েছে, সুতরাং কালের এক অভিমুখ সম্বন্ধে যা সত্য তার বিপরীত অভিমুখ

সম্বন্ধেও তা সত্য, এই বক্তব্য জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার দিক থেকে যুক্তিবিচারটি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও মারাত্মক নয়। কারণ দুই অভিমুখে সাধারণ সত্যরূপে সর্বদা সমভাবে এ শর্ত পূর্ণ হবে, চট করে এমন সিদ্ধান্তও নেওয়া উচিত নয়। খুব সাবধানে কথা সাজালে বলতে হয় যে, একটা বিশেষ ক্ষেত্রে একদিকে বা তার বিপরীত দিকে সমানভাবেই এ শর্ত পূর্ণ হতে পারে। সঙ্গে এ কথাও যোগ করতে হবে : পৃথিবীকে আমরা যেমন জানি সেই বিশেষ ক্ষেত্রে 'নিস্তেজ হবার নিম্নগতি' (প্রায়শ ব্যবহৃত পদসমষ্টিতে প্রকাশ করছি) এক দিকেই ঘটে থাকে যে দিককে আমরা অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিক বলি। অর্থাৎ সংখ্যায়নিক তাপতত্ত্বকে স্বীয় কর্তৃত্বে নিজস্ব সংজ্ঞার দ্বারা কাল কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তা নির্ধারণ করার অধিকার দিতে হবে। (পদার্থবিদের পদ্ধতির ওপর এর একটা যুগান্তকারী প্রভাব আছে। তাঁর কখনও এমন কিছুর অবতারণা করা উচিত নয় যা কালের তীর এর ওপর কোনো স্বাধীন সিদ্ধান্ত আরোপ করবে, কারণ তাহলে বোল্‌ট্‌জ্‌মানের সুন্দরভাবে গড়ে তোলা সৌধ ভেঙ্গে পড়বে।)

এমন আশঙ্কা করা যেতে পারে যে, কাল এর সংখ্যায়নিক সংজ্ঞা প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন ভৌত সমাবেশের ক্ষেত্রে একই কাল-অভিমুখ হয়ত নাও পাওয়া যেতে পারে। বোল্‌ট্‌জ্‌মান খুব সাহসের সঙ্গে এই সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন ; তিনি বলছেন যে, যদি বিশ্বজগৎ যথেষ্ট বিস্তৃত করা যায় এবং যথেষ্ট বেশি সময় ধরে চলতে থাকে তবে যথেষ্ট সময় পরে বিশ্বের কোনো সুদূরবর্তী কোণে হয়ত 'কাল' সত্যিই উল্টোদিকে যেতে পারে। এই বিষয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু আর তর্ক করে লাভ আছে মনে হয় না। বোল্‌ট্‌জ্‌মান যে কথা জানতেন না তা হলো : আমরা বিশ্বজগৎকে যে ভাবে জানি তাতে আমাদের কাছে অন্তত খুবই সম্ভব মনে হয় যে, বিশ্বজগৎ যথেষ্ট বড়ও নয়, যথেষ্ট প্রাচীনও নয় যাতে কাল এর বিপরীত গতি বড় মাপে ঘটতে পারে। খুব বিশদ ব্যাখ্যা না করেও আমি একথা বলতে পারি যে, খুব ছোট মাপের স্থান কালে তেমন বিপরীত গতি দেখা গিয়েছে (ব্রাউনীয় গতি, স্মলুচাউস্কি—Brownian Movement, Smoluchowski)।

আমার মতে কাল এর দার্শনিক দৃষ্টিকোণের ওপর 'সংখ্যায়নিক কালের তত্ত্ব'র প্রভাব আপেক্ষিকবাদের প্রভাবের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। কারণ আপেক্ষিকবাদ যতই বিপ্লবাত্মক হোক না কেন, তা কালের একমুখী গতির প্রশ্নকে স্পর্শ করে নি, তাকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু সংখ্যায়নিক তত্ত্ব ঘটনাক্রম নিরীক্ষণের ভিত্তিতে তাকে গড়ে তুলেছে। অর্থাৎ বৃদ্ধ কাল এর স্বেচ্ছাচার থেকে একটা মুক্তির পথ দিয়েছে। আমরা নিজেরাই আমাদের মনে যা গড়ে তুলি, মনের ওপর তার প্রভুত্ব করার অধিকার থাকে না, তাকে সামনে তুলে ধরার বা বিনষ্ট করার কোনো ক্ষমতাই তার থাকে না। কিন্তু কেউ কেউ একে নিশ্চয়ই অতীন্দ্রিয়বাদ আখ্যা দেবেন। তাই কয়েকটি মূলগত ধারণার ওপর নির্ভরশীলতার কারণে পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব সব সময়েই আপেক্ষিক, এই সত্যের কাছে নতি স্বীকার করেই বলছি, আমার বিশ্বাস, আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি, পদার্থ বিদ্যার তত্ত্ব—বর্তমান অবস্থায় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে **কাল** এর দ্বারা **মন** এর বিনাশ সম্ভব নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রিয়ানুভূতির গুণাবলীর রহস্য

শেষ অধ্যায়ে একটু বিশদভাবে একটা আশ্চর্য বিষয়ের আলোচনা করতে চাই, যে বিষয়ের সম্বন্ধে অ্যাবডেরার (Abdera)-র ডিমক্রিটাস (Democritus) তাঁর বিখ্যাত একটি লেখার অংশে অনেক আগেই ইঙ্গিত করেছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপারটা হলো এই, আমাদের চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় যে সব জ্ঞান আমরা অর্জন করি কিম্বা গবেষণাগারে অতি যত্নে সাধিত পরীক্ষায় আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, সে সব সম্পূর্ণরূপে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিনির্ভর, অথচ সেই জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে বহির্জগতের কোনো সম্পর্ক নির্ণয়ে অক্ষম। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে বহির্জগতের সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা বা চিত্র কল্পনা করি তা থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সব গুণগুলি অনুপস্থিত। আমার বিশ্বাস, এই বক্তব্যের প্রথম অংশ সকলে যত সহজে মেনে নিতে পারেন, দ্বিতীয় অংশ উপলব্ধি করা হয়ত তেমন সহজ নয়। কারণ অবিজ্ঞানীদের সাধারণত বিজ্ঞান সম্বন্ধে অগাধ শ্রদ্ধা এবং আমাদের বিজ্ঞানীদের 'বিশেষ সূক্ষ্ম ত্রুটিহীন পরীক্ষা পদ্ধতি'র ওপর তাঁরা এমন কৃতিত্ব আরোপ করেন যে বিশ্বাস করেন তা দিয়ে আমরা এমন কিছু আয়ত্ত করতে পারব যা স্বাভাবিক ভাবে কোনো মানুষের কখনও আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

কোনো পদার্থবিজ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হলুদ আলো বলতে তিনি কি বোঝেন, তিনি উত্তর দেবেন, হলুদ আলো হল 590 মিলি মাইক্রমের কাছাকাছি দৈর্ঘ্যের অনুপ্রস্থ (transversal) বিদুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। তারপর যদি জিজ্ঞাসা করা হয় : কিন্তু 'হলুদ' ব্যাপারটা এর মধ্যে কোথায় এলো ? তিনি বলবেন : আমার বিবরণে কোথাও তা নেই, তবে এই রকম স্পন্দন যদি কোনো সুস্থ মানুষের অক্ষিপটে আঘাত করে তবে তার মনে 'হলুদ' রঙের অনুভূতি জাগায়। আরও জানতে চাইলে শোনা যাবে যে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন রঙ এর অনুভূতি জাগায়, কিন্তু সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে তেমন ঘটে না। শুধুমাত্র 800 এবং 400 $m\mu$ এর অন্তর্বর্ত্তী দৈর্ঘ্যসম্পন্ন তরঙ্গগুলিই এইরকম অনুভূতি জাগাতে পারে। একজন পদার্থ বিজ্ঞানীর কাছে অবলোহিত (infrared) অর্থাৎ 800 $m\mu$ এর চেয়ে বেশি এবং

অতিবেগুনী (ultraviolet) অর্থাৎ 400 mμ এর চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এবং চোখে সাড়া জাগানোর উপযুক্ত 800 থেকে 400 mμ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের প্রকৃতি একই পর্যায়ের। ইন্দ্রিয়ানুভূতির এই অদ্ভুত নির্বাচনটা কেমন করে হচ্ছে? এটা স্পষ্টতই সূর্যের বিকিরণের সঙ্গে মানিয়ে নেবার পদ্ধতিতে ঘটছে, যে বিকিরণের তেজ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি এবং উভয়প্রান্তে ক্রমশ কমে গেছে। পরন্তু, সেই অঞ্চলের মধ্যেই আবার যেখানে সূর্যের বিকিরণের তেজ সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ তুঙ্গে, সেখানেই উজ্জ্বলতম রঙ 'হলুদ'-এর অনুভূতি ঘটে।

আরও একটা প্রশ্ন তোলা যায়: শুধু কি 590 mμ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আশপাশের অঞ্চলই হলুদ-এর অনুভূতি জাগায়? তার উত্তর হলো মোটেই তা নয়। লালের অনুভূতি জাগানো 590 mμ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এবং সবুজের অনুভূতি জাগানো 535 mμ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশালে সেই মিশ্রণও হলুদ রঙ-এর অনুভূতি জাগাবে। দু'টি পাশাপাশি ক্ষেত্রে যদি এই মিশ্রণ এবং বর্ণালীর বিশুদ্ধ তরঙ্গের আলো ফেলা যায়, তবে কোনটা কিভাবে উৎপন্ন তা বোঝা যাবে না। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিষয়ক জ্ঞান থেকে কি এই ঘটনা ঘটবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব? তরঙ্গের এই ভৌত বস্তুনিষ্ঠ বিশেষত্বর সঙ্গে কি সংখ্যার কোনো যোগসূত্র আছে? না তা নেই। অবশ্য এই ধরনের মিশ্রণের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের লেখচিত্র তৈরি করা হয়েছে, যাকে রঙ-এর ত্রিকোণ বলা হয়। কিন্তু তার সঙ্গে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কোনো যোগাযোগ নেই। বর্ণালীর দু'ধারের দুই রঙ মেশালে মাঝের রঙটা পাওয়া যাবে এমন কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। যেমন—বর্ণালীর দুই প্রান্তের রঙ 'লাল' ও 'নীল' মিশলে একধরনের 'জাম' (purple) রঙ পাওয়া যাবে, বর্ণালীর কোনো একক আলো যে রঙ সৃষ্টি করে না। আবার রঙ-এর ত্রিকোণ এরও এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এবং কারো কারো ক্ষেত্রে এই পার্থক্য খুবই বেশি—যাদের নিয়ম বহির্ভূত ত্রিরঙবোধী বলা হয় (তারা কিন্তু বর্ণান্ধ নয়)।

আলোকতরঙ্গ সম্বন্ধে পদার্থবিজ্ঞানীর বস্তুনিষ্ঠ চিত্রকল্পের সাহায্যে রঙ-এর অনুভূতির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। রেটিনার সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগসূত্রকারী স্নায়ুগুচ্ছ-সমূহের চালচলন পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও বিশদ জ্ঞানের সাহায্যে শারীরতত্ত্ববিদ কি এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা করতে পারবেন? আমার তা মনে হয় না। আমাদের

দৃষ্টিক্ষেত্রের কোনো বিশেষ দিকে বা অঞ্চলে আমাদের মন হলুদ রঙ-এর অস্তিত্ব অনুভব করলে বড়জোর আমরা হয়ত বস্তুনিষ্ঠভাবে জানতে পারব তখন কোন্ কোন্ স্নায়ুতন্ত্রী কি অনুপাতে উত্তেজিত হচ্ছে। হয়ত বা নিশ্চিতভাবে জানতে পারব কোন্ কোন্ মস্তিষ্ক কোষে সেগুলি কি ঘটনা ঘটাচ্ছে। কিন্তু অত বিশদ নিখুঁত জ্ঞান ও আমাদের রঙ-এর অনুভূতি সম্বন্ধে কিছুই খবর দেবে না। সেই বিশেষ দিকে হলুদের অস্তিত্বের অনুভূতির কারণ জানাবে না। শরীরের ভিতরের এই একই প্রক্রিয়া হয়ত মিষ্টি স্বাদ বা অন্য যে কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত এমন কল্পনাও করা যেতে পারে। আমি বলতে চাই, কোনো স্নায়বিক প্রক্রিয়ার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণের মধ্যেই 'হলুদ রঙ' বা 'মিষ্টি স্বাদ'-এর বিশেষত্ব যুক্ত নেই, সে বিশেষত্ব যেমন বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণের মধ্যেও নেই।

অন্যান্য অনুভূতির ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। আমরা যে রঙ-এর অনুভূতির বিষয়ে আলোচনা করলাম তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দানুভূতির তুলনা আকর্ষণীয় হবে মনে হয়। বাতাসে ঘন এবং হাল্কা চাপের স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ সঞ্চলনই সাধারণত আমাদের কাছে শব্দ পৌঁছে দেয়। সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা আরও নিখুঁতভাবে বললে কম্পাঙ্কই শ্রুত শব্দের তীক্ষ্ণতা নির্দিষ্ট করে। (দ্রষ্টব্য: তরঙ্গদৈর্ঘ্য নয়, তরঙ্গের কম্পাঙ্কের ভূমিকাই শারীরিক সাড়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। আলোর ক্ষেত্রেও তাই, তবে সে ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান পরস্পরের প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ শূন্যস্থানে বা বায়ুতে আলোক তরঙ্গ অগ্রসরের গতিবেগের মধ্যে কোনো প্রভেদ বোঝাই যায় না)। শ্রুতিগোচর শব্দ এবং দৃষ্টিগোচর আলোর কম্পাঙ্কের সীমার বিস্তৃতির অনেক তফাৎ একথা বলাই বাহুল্য। শব্দের ক্ষেত্রে প্রতি সেকেণ্ডে 12 বা 16 থেকে 20,000 বা 30,000 আর আলোর ক্ষেত্রে কয়েকশো (ইংলিশ) বিলিয়ন অর্থাৎ 10^{12}। অবশ্য শব্দের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বিস্তার খুবই বেশি, প্রায় দশ সপ্তক (octave) ব্যাপী (যেখানে দৃশ্যমান আলোর ক্ষেত্রে মাত্র এক-সপ্তকের কাছাকাছি); তাছাড়া ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে শব্দানুভূতির তফাৎ ঘটে, বিশেষত বয়সের সঙ্গে; শব্দের তীক্ষ্ণতার উচ্চসীমার বোধ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায়। কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হলো কয়েকটি স্পষ্ট বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট কম্পাঙ্কের শব্দ মিশ্রণের

ফলে সেগুলির মধ্যবর্তী কম্পাঙ্কের তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন শব্দ সৃষ্টি হয় না। বিভিন্ন তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন স্বরগুলি যুগপৎ ধ্বনিত হলেও অনেকসময় আলাদাভাবে অনুভূত হয় বিশেষ করে উচ্চমানের সঙ্গীতবোধসম্পন্ন মানুষদের কাছে। বিভিন্ন তীব্রতার ও প্রকৃতির অধিস্বর (overtone) সমন্বয়ের ফলশ্রুতি যে ধ্বনি বৈশিষ্ট্য (জার্মান ভাষায় klangsfarbe) সৃষ্টি করে তার সাহায্যেই আমরা বিউগ্‌ল্‌, বেহালা, গীর্জার ঘণ্টা, পিয়ানো ইত্যাদি থেকে একটিমাত্র ধ্বনিত স্বর থেকেই যন্ত্রগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি। এমন কি কর্কশ আওয়াজেরও ধ্বনি বৈশিষ্ট্য আছে যার থেকে বোঝা যায় কি ঘটছে। আমার কুকুরটিও তার পরিচিত একটা বিশেষ বিস্কুটের টিন খোলার অদ্ভুত আওয়াজ চেনে, যার থেকে সে মাঝে মাঝে এক আধটা বিস্কুট পায়। সহযোগী কম্পাঙ্কগুলির অনুপাতের প্রভাবই এইসব শব্দের প্রকৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সবগুলি কম্পাঙ্ক যদি সমান অনুপাত বজায় রেখে পরিবর্তিত হয়, যেমন গ্রামোফোন যদি খুব দ্রুত বা শ্লথ গতিতে চালানো হয়, তবে কি বাজানো হচ্ছে চিনতে অসুবিধা হয় না। তবুও শব্দের প্রকৃতির কোনো কোনো উপাদানের ধ্বনির কিছু বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য কম্পাঙ্কের পরম মানের ওপরও নির্ভর করে। গ্রামোফোন রেকর্ডে যদি মানুষের কণ্ঠস্বর অতি দ্রুত বাজানো হয় তবে স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণ বদলে যায়। বিশেষ করে কার (car)-এর 'a'-র যেরকম উচ্চারণ হয় সেটা পরিবর্তিত হয়ে কেয়ার (care)-এর 'a'-র মত শোনায়। পাশাপাশি সারিবদ্ধ কম্পনাঙ্কের ধ্বনি সর্বদাই শ্রুতিকটু, তা পর পর একটানাই হোক, যেমন সাইরেন বা বিড়ালের চীৎকার, কিম্বা একযোগেই ধ্বনিত হোক। অবশ্য একগাদা সাইরেন আর একদল চীৎকার করা বিড়াল জড়ো করা ছাড়া সেটা কার্যে পরিণত করা শক্ত। এ ব্যাপারটাও আলো দেখার থেকে আলাদা রকমের। যে সব আলো আমরা সাধারণত দেখি তা বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর অবিচ্ছিন্ন মিশ্রণে সৃষ্ট। আর চিত্রে বা প্রকৃতিতে এক রঙ থেকে আর এক রঙে ক্রমিক বিন্যাসে মিশ্রণ চোখে দেখতে অনেক সময় অপূর্ব সুন্দর লাগে।

শব্দ অনুভূতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কর্ণেন্দ্রিয়ের কলকজার সাহায্যে ভালভাবেই বোঝা যায়। এ বিষয়ে আমাদের চোখের রেটিনার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার চেয়ে বিশদ ও স্পষ্ট জ্ঞান আছে। প্রধান যন্ত্র হলো কক্লিয়া (cochlea) বা একটা কুণ্ডলীকৃত হাড়ের নল, যার সঙ্গে একধরনের সামুদ্রিক শঙ্খের মিল আছে; একটা

ছোট ঘোরানো সিঁড়ি যেন ওপরে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে ; সিঁড়ির ধাপের জায়গায় (আমাদের তুলনাটা বজায় রাখলে) ঘোরানো রেলিং-এর দু'প্রান্তের মধ্যে সারিবদ্ধ স্থিতিস্থাপক তন্তু টান হয়ে আছে, যা দিয়ে একটা পর্দা তৈরি হয়েছে। এই পর্দার প্রস্থ (বা এক একটি তন্তুর দৈর্ঘ্য) 'নিচ' থেকে ওপরে ক্রমশ কমে গেছে। হার্প অথবা পিয়ানোর তারের ক্ষেত্রে যেমন হয় সেইভাবে বিভিন্ন তন্তুগুলি দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কম্পাঙ্কের স্পন্দনে যান্ত্রিকভাবে সাড়া দিয়ে আন্দোলিত হয়। এক একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের প্রতি পর্দাটির এক একটি বিশিষ্ট ছোট আয়তনের অঞ্চল (শুধু একটি তন্তু নয়) সাড়া দেয়, যেখানে তন্তুগুলি হ্রস্বতর সেই অঞ্চল উচ্চতর কম্পাঙ্কের প্রতি সাড়া দেয়। এইরকম প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্রী গোষ্ঠীতে এক একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে স্পন্দিত কম্পন সৃষ্টি হতে হবে—স্নায়বিক ঘাতরূপে সুপরিচিত সেই কম্পন মস্তিষ্কের কর্‌টেক্স (cortex) বা ধূসর অংশের একটা বিশেষ অঞ্চলে পরিবাহিত হবে। আমাদের সাধারণ জ্ঞানে জানা আছে যে, এই পরিবহণ প্রক্রিয়া সব স্নায়ুতন্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম, শুধু উত্তেজনার তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। উত্তেজনার তীব্রতার তারতম্য ঘাতগুলির প্রবাহের বারম্বারতা বণ্টনকে প্রভাবিত করে। তার সঙ্গে শব্দের কম্পনের বারম্বরতা বা কম্পাঙ্ককে যেন গুলিয়ে ফেলা না হয় (এ দু'টির পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই)।

চিত্রটা কিন্তু আমরা যতটা মনে করছি ততটা সরল নয়। ধ্বনি বৈশিষ্ট্য এবং স্বরের তীক্ষ্ণতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য নির্ণয়ের যে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা বাস্তবক্ষেত্রে কানযন্ত্রের অধিকারীর আছে, একজন পদার্থবিদ তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কানযন্ত্র তৈরি করতে চাইলে অন্যভাবে করতেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত হয়ত আবার, যেমন আছে তেমনিভাবেই গড়তেন। আমরা যদি বলতে পারতাম যে, কক্লিয়ার আড়াআড়ি তন্তুর সারির মধ্যে এক একটি একক তন্তু আগত উত্তেজক স্পন্দনের শুধু একটি-মাত্র নির্দিষ্ট তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন কম্পাঙ্কেই সাড়া দেয় তবে ব্যাপারটা সরলতর এবং সুন্দরতর হতো। তা হয় না। কিন্তু কেন হয় না ? কারণ এই 'তন্তু'গুলির স্পন্দন প্রবলভাবে অবমন্দিত হয়। এর ফলস্বরূপ এদের অনুনাদের এলাকা বিস্তৃত করে দেয়। আমাদের পদার্থবিদ হয়ত তন্তুগুলির অবমন্দন তাঁর পক্ষে যতদূর কম করা সম্ভব তেমন করে বানাতেন। কিন্তু তার ফল সাংঘাতিক হতো।

শব্দ সৃষ্টিকারী তরঙ্গ কম্পন থেমে যাবার প্রায় তৎক্ষণাৎ পরেই শব্দের অনুভূতি চলে যেতনা, কিছুক্ষণ ধরে থেকেই যেত। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্কলিয়ার স্বল্পহারে অবমন্দিত অনুনাদক না থামে ততক্ষণ থেকে যেত। কাজেই, একটি স্বরের তীক্ষ্ণতার তারতম্য সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় ক্ষমতা আয়ত্ত করতে গিয়ে তার পরবর্তী শব্দের মাঝখানের সময়ের ব্যবধান নির্ণয় করার ক্ষমতা হারাতে হচ্ছে। বাস্তবক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলে কি করে এই দুই ব্যাপারের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটানো হয়েছে ভাবতে বিস্ময়াভিভূত লাগে।

পদার্থবিদ বা শারীরবিদ কারো বিবরণের মধ্যেই যে শব্দ অনুভূতির কোনো স্থান নেই এ কথাটা বোঝানোর জন্যই এই বিষয়টা নিয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনা করলাম। এ ধরনের যে কোনো বিবরণ এইরকম একটি বাক্য দিয়ে শেষ হতে বাধ্য : ওইসব স্নায়বিক ঘাতগুলি মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশে পরিবাহিত হয়ে শব্দগুলির ক্রমিক বিন্যাসরূপে নথিভূক্ত হয়। বাতাসের চাপের যে পরিবর্তন কর্ণপটহে স্পন্দন সৃষ্টি করে তা আমরা বিশদভাবে লক্ষ্য করতে পারি ; আমরা দেখতে পারি সেই স্পন্দন কিভাবে ছোট ছোট অস্থিশৃঙ্খলের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে আর একটি ঝিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় এবং অবশেষে যায় কর্কলিয়ার ভেতরের ঝিল্লিতে, যেখানে পূর্ববর্ণিত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তন্তুগুলি আছে। আমরা এও বুঝতে পারি এইসব কম্পনশীল তন্তু যে সব স্নায়বিক তন্তুর সংস্পর্শে আছে তাতে কিভাবে বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক পরিবহণ প্রক্রিয়া সঞ্চার করে। মস্তিষ্কের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সেই সঞ্চলন লক্ষ্য করে আমরা সেখানে কি কি ঘটছে, সে সম্বন্ধে একটা বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানও পেতে পারি। কিন্তু কোনো জায়গাতেই, আমাদের এই বৈজ্ঞানিক চিত্রতে 'শব্দরূপে ধরাপড়া' ব্যাপারটা খুঁজে পাব না। সেটা শুধু আছে যে ব্যক্তির কান ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি, তার মনের ভিতরে।

আমরা স্পর্শ, উষ্ণতা ও শৈত্য, গন্ধ এবং স্বাদের অনুভূতি সম্বন্ধেও একই ভাবে আলোচনা করতে পারতাম। শেষোক্ত দু'টিকে রাসায়নিক অনুভূতি বলা হয় (গন্ধ বায়বীয় কিছু বস্তু, এবং স্বাদ তরল কিছু বস্তু বিশ্লেষণ করে)। এই অনুভূতি দুটির দর্শন অনুভূতির সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে—তা হলো অনেক ধরনের উত্তেজনা খুব কম সংখ্যক অনুভূতির শ্রেণীতে সাড়া জাগায়। স্বাদের ক্ষেত্রে তা হলো তেতো,

মিষ্টি, টক ও নোনতা এবং তাদের অদ্ভুত ধরনের মিশ্রণ। আমার বিশ্বাস স্বাদের চেয়ে গন্ধের অনেক বেশি বৈচিত্র্য আছে। বিশেষ করে কোনো কোনো জীবজন্তুতে এই অনুভূতি মানুষের চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম। কোনো ভৌত বা রাসায়নিক উত্তেজকের কোন বস্তুগত উপাদান অনুভূতিতে কি রকম লক্ষণীয় পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে, জীবজগতে তার বিরাট প্রকারভেদ আছে বলে মনে হয়। যেমন মৌমাছিদের রঙ-এর অনুভূতি আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী পর্যন্ত বিস্তৃত; তারা প্রকৃতপক্ষে ত্রিবর্ণ সচেতন—দ্বিবর্ণী নয়। সেটা পূর্বের পরীক্ষায় ধরা পড়েনি — আলট্রাভায়োলেটকে বাদ দেওয়া হয়েছিল বলে। মৌমাছিরা আলোর অতি সামান্য সমবর্তন (Polarisation) অদ্ভুতভাবে অনুভব করতে পারে। কিছুকাল পূর্বে এই বিশেষ অকর্ষণীয় আবিষ্কার করেছেন মিউনিখ (Munich) -এ ফন ফ্রিশ (Von Frich)। এই অনুভূতির সাহায্যে মৌমাছিরা অত্যন্ত রহস্যজনক জটিল প্রক্রিয়ায় সূর্যকিরণের সঙ্গে নিজেদের শরীরের কৌণিক অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ সম্পূর্ণ সমবর্তিত (Polarised) এবং সাধারণ অসমবর্তিত আলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। বাদুড়েরা অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের স্পন্দন (শ্রবণাতীত শব্দ) অনুভব করতে পারে যা মানুষের কম্পাঙ্ক শ্রবণের ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমার অনেক ঊর্ধ্বে। বাদুড়েরা নিজেরাও সেইরকম কম্পন সৃষ্টি করে তা রাডারের মত ব্যবহার করে বাধা এড়িয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। মানুষের গরম ও ঠাণ্ডা অনুভূতির ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে 'les extrêmes se touchment' : আমরা যদি অসাবধানে খুব ঠাণ্ডা কিছু স্পর্শ করি তবে মুহূর্তের জন্য মনে হবে তা ভীষণ গরম এবং আমাদের হাত পুড়িয়ে দিচ্ছে।

কুড়ি তিরিশ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের রসায়নবিদরা একরকম সাদা গুঁড়ো আবিষ্কার করেছিলেন (যার রাসায়নিক নাম আমি ভুলে গিয়েছি) যা কিছু মানুষের পক্ষে স্বাদহীন এবং কিছু মানুষের পক্ষে অত্যন্ত তিক্ত। এই তথ্য বিরাট কৌতূহল সৃষ্টি করেছে এবং পরবর্তীকালে ঐ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে। (এই বিশেষ জিনিসের 'স্বাদগ্রাহক' গুণটি ব্যক্তির সহজাত, অন্য কোনো শর্ত নির্ভর নয়। এবং এই গুণ মেণ্ডেলের বিধি অনুসারে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। রক্তের গ্রুপ-এর বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার একইভাবে পরিবাহিত হবার সূত্রে এই বিধির সঙ্গে আমরা পরিচিত। শেষোক্ত ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনি 'স্বাদ গ্রাহক' বা

'অগ্রাহক' শ্রেণীভুক্ত মানুষের কোনো বিশেষ সুবিধা বা অসুবিধা ভোগের প্রশ্ন নেই। বিষমযুগ্মের (Heterozygotes) দুটি 'বিকল্প (Alleles)'-এর মধ্যে স্বাদগ্রাহকের ক্ষেত্রে একটি প্রাধান্য লাভ করে বলে আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয় এই বিশেষ জিনিসটি—যেটি হঠাৎ আবিষ্কার হয়েছে, সেটিই একমাত্র এই ধরনের জিনিস নয়। খুব সম্ভব স্বাদ বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম এটা একটা সাধারণ সত্য।

এবার আবার আলোর প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক এবং একটু গভীরে অনুসন্ধান করা যাক কিভাবে আলো উৎপন্ন হয় আর কি ভাবেই বা পদার্থবিদ তার বস্তুনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বিচার করেন। আমার মনে হয় এতদিনে একথা সর্বসাধারণের সুবিদিত যে, আলো সাধারণত ইলেকট্রনের দ্বারা সৃষ্টি হয়, বিশেষত যখন ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস (Nucleus)-এর চারপাশে 'কিছু একটা ঘটায়'। ইলেকট্রন লাল বা নীল বা কোনো রঙেরই নয়; হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস প্রোটন-এর ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। কিন্তু পদার্থবিদের মতে এ দুইয়ের মিলনে হাইড্রোজেন পরমাণুতে কয়েকটি বিভিন্ন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সারিতে বিন্যস্ত বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ সৃষ্ট হয়। এই বিকিরণের সমসত্ত্ব উপাদানগুলি প্রিজ্‌ম্ (ত্রিপাল কাচ) অথবা আলোকীয় গ্রেটিং-এর ভিতর দিয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পার হলে দর্শকের মনে কিছু শারীরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে লাল সবুজ নীল ইত্যাদি বিশিষ্ট রঙ-এর অনুভূতি জাগায়। এই শারীর ক্রিয়াগুলির সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে এত ভালভাবে জানা আছে যে, জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, ক্রিয়াগুলি লালও নয়, সবুজও নয়, নীলও নয়। বস্তুত প্রাসঙ্গিক স্নায়বিক উপাদানগুলি উত্তেজিত হবার দরুন কোনোরকম রঙ প্রদর্শন করে না; কোনো ব্যক্তির স্নায়ুকোষগুলি উত্তেজিত হলে তার যে রঙ-এর অনুভূতি জাগে তার তুলনায় সেই কোষগুলির উত্তেজিত হলে বা না হলেও যে সাদা বা ধূসর রঙ দেখা যায় তা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য নয়।

তবু জ্বলন্ত হাইড্রোজেন বাষ্পের বর্ণালীর কোনো কোনো অংশের কয়েকটি রঙীন রেখা দেখতে পাওয়া থেকেই পরমাণুর বিকিরণ সম্বন্ধে আমাদের নানা বস্তুগত নিরপেক্ষ জ্ঞান সংগ্রহ সুরু হয়েছিল। এইভাবে প্রাথমিক জ্ঞান পাওয়া গেল, কিন্তু তা কখনই সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়। সে জ্ঞান পাবার জন্য অনুভূতির অংশকে তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হয়েছে। এই বিশিষ্ট উদাহরণ থেকে বিষয়টি অনুসরণ করা ফলপ্রসূ হবে। রঙ স্বকীয়ভাবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারে না;

বস্তুত আমরা আগে যেমন দেখেছি, বর্ণালীর হলুদ আলো পদার্থবিদের সংজ্ঞায় 'একবর্ণী' নাও হতে পারত, যদি আমরা না জানতাম যে আমাদের বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র তৈরির পদ্ধতি সে সম্ভাবনাকে বাদ দিচ্ছে। যন্ত্রটি একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বর্ণালীর একটি নির্দিষ্ট দিকে স্থাপন করেছে। যে কোনো উৎস থেকেই উৎসারিত হোক, সে স্থানের আলোর ঠিক একটি নির্দিষ্ট রঙ হবে। তবুও রঙ অনুভূতির প্রকৃতি, তার ভৌত ধর্ম—তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোনো খবরই দিতে পারে না। তাছাড়া আমাদের বিভিন্ন রঙ-এর তফাৎ বিশ্লেষণ ক্ষমতার দৈন্য একজন পদার্থ-বিজ্ঞানীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে তার উল্টোভাবে, দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নীলের অনুভূতি এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যে লালের অনুভূতি জাগাতে পারে এমন কল্পনা **আগে থেকেই** না করার কোনো কারণ নেই।

কোনো উৎস থেকে বিকীর্ণ আলোর ভৌত ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের একটা বিশেষ ধরনের বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার প্রয়োজন ; আলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করার জন্য ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং (diffraction grating) দরকার। প্রিজ্‌ম্ দিয়ে কাজ হবে না। কারণ কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর জন্য প্রিজ্‌ম্-এর প্রতিসরণ কোণ কত হবে তা আগের থেকে জানা যায় না। বিভিন্ন বস্তু দিয়ে তৈরি প্রিজ্‌ম্-এর ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন রকম হবে। বস্তুত প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে, অর্থাৎ ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যকেই প্রিজ্‌ম্ বেশি বাঁকাবে তা **আগে থেকেই** বলা যায় না।

ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং-এর তত্ত্ব প্রিজ্‌ম্ এর তত্ত্বের চেয়ে আরও সহজ। তরঙ্গরূপ আলোর বস্তুগত ভিত্তি, শুধু এই কথাটা ধরে নিয়ে গ্রেটিং-এর প্রতি ইঞ্চিতে যতগুলি সমদূরবর্তী খাদের রেখা আছে (সাধারণত কয়েক হাজার) মেপে নিলেই গ্রেটিংটি কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকে কতখানি বাঁকাবে তা জানা যাবে। পক্ষান্তরে, বাঁকের কোণ এবং 'গ্রেটিং-এর ধ্রুবক' জানা থাকলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য জানা যাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে (বিশেষত জিমান এবং স্টার্ক এফেক্ট, Zeeman এবং Stark effect) বর্ণালীর কোনো কোনো রেখার আলোর স্পন্দন সমবর্তিত হয়ে যায়। যেহেতু এই ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের চোখ সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন, এ ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বস্তুগত বিবরণ দিতে হলে, আলোর এই বিশেষ ধরনের মিশ্রণের উপাদান বিশ্লিষ্ট করে দেখতে গেলে আলোর পথে একটা সমবর্তক (নিকল প্রিজ্‌ম্—Nicol

prism) রাখতে হবে। নিকলকে ধীরে ধীরে তার অক্ষের চতুর্দিকে ঘোরালে তার একটা বিশেষ কৌণিক অবস্থানে বর্ণালীর কিছু কিছু রেখাকে লুপ্ত হতে কিম্বা সেগুলির উজ্জ্বলতা খুব কমে যেতে দেখা যায়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে আলোর (রশ্মির গতিপথের লম্বতলে) সম্পূর্ণ কিম্বা অংশিক সমবর্তনের অভিমুখ নির্ণয় করা যায়।

একবার এই পদ্ধতি গড়ে তুলতে পারলে দৃষ্টিগ্রাহ্য আলোর সীমা অতিক্রম করে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যাবে। জ্বলন্ত বাষ্পীয় পদার্থের বর্ণালীর রেখাগুলি তো শুধু দৃশ্যমান অংশেই সীমাবদ্ধ নয়, এবং সেই অংশের কোনো বিশেষ বস্তুগত বৈশিষ্ট্যও নেই। রেখাগুলি পর পর সাজানো দীর্ঘ সারি—তাত্ত্বিক নিরিখে অসীম সারি বিন্যাস গঠন করে। প্রত্যেক সারির তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সেই সারির বিশিষ্ট গাণিতিক নিয়মে বাঁধা, যে নিয়ম একই রকম ভাবে সম্পূর্ণ বর্ণালী জুড়ে ব্যাপ্ত। দৃশ্যমান অঞ্চলের অংশে কোনো বিশেষভাবে চিহ্নিত বস্তুগত নিয়ম নেই। এই সারি সাজানোর নিয়ম প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা খবর থেকে পাওয়া গেছে, এবং এখন তাত্ত্বিকভাবে বোঝা গেছে। স্বভাবতই দৃশ্যমান অংশের বাইরে চোখের জায়গায় ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করতে হবে। শুধু কয়েকটি দৈর্ঘ্যের মাপ থেকেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাপ বোঝা যাবে : প্রথমত গ্রেটিং-এর ধ্রুবক, অর্থাৎ গ্রেটিং-এর পাশাপাশি দু'টি দাগের মধ্যে ব্যবধান (একক দৈর্ঘ্যে যতগুলি দাগ আছে তার বিপরীত রাশি) এবং যন্ত্রের অন্যান্য জানা কয়েকটি পরিমাপ সহযোগে, ফটো প্লেটের ওপর বর্ণালীর রেখার অবস্থান দেখে আলোর গতিপথের বিচ্যুতির হিসাব করা সম্ভব।

এ সব ভালভাবেই জানা কথা, কিন্তু আমি সাধারণ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দিতে চাই, যা প্রায় সমস্ত ভৌত মাপজোখের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

যে ব্যাপার নিয়ে এতক্ষণ বিশদভাবে আলোচনা করলাম তার বিবরণ দিতে গেলে অনেকসময় বলা হয় যে, মাপার যন্ত্র এবং পদ্ধতি যত শুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম রূপ নেয়, ততই আরও ব্যাপক যন্ত্রপাতি ধীরে ধীরে নিরীক্ষকের স্থান অধিকার করে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে একথাটা মোটেই সত্য নয় ; নিরীক্ষক ধীরে ধীরে অপসারিত হয় না, প্রথম থেকেই হয়। আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে বাইরের যে সব ঘটনা

নিরীক্ষকের মনে রঙ-এর অনুভূতি সৃষ্টি করে তার ভৌত প্রকৃতি সম্বন্ধে সে অনুভূতি কোনো খবরই দেয় না। গ্রেটিং-এর সূক্ষ্ম দাগ টানা এবং কয়েকটি কোণ এবং দৈর্ঘ্য মাপার আগে আলোর বস্তুগত প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করাও সম্ভব নয়। সেটা প্রথম সঙ্গত ধাপ। তারপর এই পদ্ধতির যে সব সূক্ষ্ম উন্নততর পরিবর্তন ধাপে ধাপে করা হয়েছে, তা যতই উন্নত মানের হোক, জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দ্বিতীয় কথা হলো যন্ত্রপাতি কখনই সম্পূর্ণভাবে নিরীক্ষকের স্থান অধিকার করে না। তাই যদি হতো, তবে স্পষ্টতই পর্যবেক্ষক কোনো জ্ঞানই পেত না। সে নিশ্চয়ই যন্ত্রটা তৈরি করেছে এবং তৈরির সময় এবং পরে নিশ্চয়ই যত্ন করে তার বিভিন্ন অংশের মাপজোখ করেছে (যেমন, শঙ্কুর আকারের পিনের ওপর স্থাপিত কোনো বাহুর বৃত্তাকারে স্কেলের ওপর কৌণিক ঘোরার মাপ) যাতে যতটুকু ঘোরা দরকার তা ঠিক মাপমত হয়েছে কিনা বোঝা যায়। এ কথা সত্য যে, কোনো কোনো মাপজোখের জন্য পদার্থবিদ নিশ্চয়ই কারখানায় যাঁরা যন্ত্র তৈরি করেছেন তাঁদের ওপর নির্ভর করেছেন ; তবু যতই বুদ্ধি করে শ্রম লাঘবের জন্য যন্ত্র পরিকল্পনা করা হোক, এ সব কিছুর খবর শেষ পর্যন্ত এক বা ততোধিক জীবিত ব্যক্তির অনুভূতির ওপর নির্ভর করেছে। শেষ পর্যন্ত, গবেষণার জন্য যন্ত্রটি ব্যবহার করতে গিয়ে পর্যবেক্ষককেই যন্ত্র থেকে পাওয়া কিছু পরিমাপ পড়ে দেখতে হবে। তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় সোজাসুজি কোণ বা দৈর্ঘ্যে মাপই হোক, কিম্বা ফটো প্লেটে ধরে রাখা বর্ণালীর রেখাগুলির মধ্যে ব্যবধানই হোক। অনেক যান্ত্রিক কৌশল এই কাজে সহায়তা করতে পারে। যেমন—স্বচ্ছ প্লেটের ভেতর দিয়ে আলোকমিতি (Photometry) পদ্ধতি ব্যবহার করে চিত্রকে বিবর্ধিত অবস্থায় (magnified) পর্যবেক্ষণ করা, যাতে রেখাগুলির অবস্থান আরও সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু সেগুলির পাঠ গ্রহণ করতেই হবে। তখনই নিরীক্ষকের অনুভূতির আগমন হবে। যথাসম্ভব যত্নে নথিভুক্ত তথ্যও পর্যবেক্ষণ না করলে কিছুই খবর দেয় না।

সুতরাং আবার আমরা এই অদ্ভুত অবস্থায় ফিরে এলাম। একদিকে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভিজ্ঞতা সেগুলির ভৌত বস্তুনিষ্ঠ চরিত্র (বা এই বলে সাধারণত আমরা যা অভিহিত করি) সম্বন্ধে কোনো খবরই দেয় না, এবং খবর আহরণের

সূত্র পাবার দিক থেকে সেই অনুভূতিকে প্রথম থেকেই পরিত্যাগ করতে হয়, অন্য দিকে শেষ পর্যন্ত যে তাত্ত্বিক চিত্র আমরা পাই তার ভিত্তি কিন্তু জটিলভাবে বিন্যস্ত নানা খবরের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে সব খবর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারাই সংগৃহীত। চিত্রটি সে সব খবরের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে সবের টুকরো জুড়ে গঠিত, কিন্তু তবুও চিত্রটির মধ্যে সে সবের অস্তিত্ব আছে বলা যায় না। আমরা চিত্রটি ব্যবহার করার সময় এই কথাটা ভুলেই যাই, শুধু সাধারণভাবে বলা হয় যে, আলোর তরঙ্গ প্রকৃতির ধারণাটা কোনো পাগলের আবোল তাবোল চিন্তা উদ্ভূত নয়, পরীক্ষালব্ধ ফলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিরাট খ্যাতিমান ডিমক্রিটাস এই পরিস্থিতিটা পরিষ্কার বুঝেছিলেন, এ কথা যখন আমি জানতে পারলাম তখন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। ভৌত পরিমাপের যে সব পদ্ধতির কথা বললাম (যেগুলি বর্তমানযুগে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির মধ্যে সরলতম) সে সবের সঙ্গে সুদূরতম তুলনার যোগ্য কোনো পদ্ধতির জ্ঞান ছাড়াই তিনি পরিস্থিতিটা বুঝেছিলেন।

গ্যালেনা (Galana) কিছু লেখা সংরক্ষণ করেছেন (Diels fr, 125) যাতে ডিমক্রিটাস বাস্তবতা সম্পর্কে বুদ্ধির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটা বিতর্ক উপস্থিত করেছেন। বুদ্ধি বলছে, মনে হয় রঙ আছে, মনে হয় মিষ্টত্ব আছে, মনে হয় তিক্ততা আছে, কিন্তু আসলে আছে কিছু পরমাণু ও শূন্যস্থান। অনুভূতি বলছে, 'বেচারা বুদ্ধি! তুমি তোমার সাক্ষ্যগুলি আমাদের কাছ থেকে ধার করে আমাদেরই হারিয়ে দেবে বলে আশা কর? তোমার জয়ই তোমার পরাজয়।'

এই পরিচ্ছেদে আমি বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিনয়ী শাখা পদার্থবিজ্ঞান থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দু'টি সাধারণ সত্যের মধ্যে বৈপরীত্য দেখাতে চেষ্টা করছি : (ক) ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি (খ) তবুও প্রকৃতির ঘটনাবলীর সম্বন্ধে এইভাবে গঠিত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনুভূতিভিত্তিক গুণগুলির কোনো স্থান নেই। সুতরাং অনুভূতির কারণ সম্বন্ধে সে দৃষ্টিভঙ্গী কিছুই বলতে পারে না। একটা সাধারণ মন্তব্য করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষালব্ধ ফলগুলির সমীক্ষা করতে সাহায্য করে। সব বিজ্ঞানীই জানেন, একটা ব্যাপক বিস্তৃত তথ্যসমষ্টি মনে রাখা কত কঠিন, যতক্ষণ সেগুলির একটা অন্তত প্রাথমিক তাত্ত্বিক চিত্র

গড়ে তোলা না যায়। সুতরাং মৌলিক প্রবন্ধ বা পাঠ্যপুস্তকের লেখকরা একটা সুসঙ্গত সুসংবদ্ধ তত্ত্ব গঠিত হবার পর যদি যে সব অনাবৃত তথ্য তারা পেয়েছেন বা পাঠককে জানাতে চেয়েছেন, সেগুলিকে তত্ত্ব বা তত্ত্বগুলির পরিভাষার আড়ালে আবৃত রাখেন তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই বা তাতে তাঁদের দোষও দেওয়া যায় না। এই পদ্ধতি তথ্যগুলিকে একটা সুসংবদ্ধ বিন্যাসে মনে রাখার পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও এতে বাস্তব পর্যবেক্ষণ এবং তার থেকে উদ্ভূত তত্ত্বের ভিতরে পার্থক্যকে বিলুপ্ত করার প্রবণতা আছে। এবং যেহেতু পর্যবেক্ষণের সবসময়েই একটা অনুভূতিজাত গুণ রয়েছে, সহজেই মনে হয় তত্ত্বগুলি বুঝি অনুভূতির কারণ জানায়। আসলে অবশ্য তত্ত্বগুলি কখনও তা করে না।

"মাইণ্ড এ্যাণ্ড ম্যাটার" অথবা "মন ও জড়বস্তু"—এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়টি এই বইতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বিষয়টি অনাদিকাল থেকে দার্শনিকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে বিভ্রান্তিকর জটিল ধাঁধাঁর সমস্যার সম্মুখীন করেছে। মানব জীবনে চেতনার স্থান কি? নৈতিক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে মানব মনের বিকাশের ধারার ভূমিকা কি? এইসব অনুভূতির গুণগুলির অনুপস্থিতির তাৎপর্যই বা কি? শ্রয়েডিংগার সেই সব প্রশ্ন সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতিগোচর জগতের বাইরের কি একটি মাত্র সত্য বাস্তব জগৎ আছে?

বইটি একটি রত্ন। যার নানা দিক থেকে আলো বিচ্ছুরিত ·········। কয়েক ঘণ্টায় এটি পড়ে ফেলা যায়; কিন্তু সারা জীবনও ভোলা যায় না।

জেমস্ আর নিউম্যান
সাইন্টিফিক আমেরিকা